গৌতম-উদয়নের হস্তরেখা কী বলছে?

ডুয়ার্সের পর্যটন উদ্যোগ: পূজা পরিক্রমা

ডুয়ার্সের প্রাচীন কালীমূর্তি ইতিহাসের মিসিং লিঙ্ক

# এখন ডুয়ার্স

নভেম্বর ২০১৫। ১২ টাকা

# দীপান্বিতা

## ডুয়ার্সের অন্ধকার আদৌ কি ঘুচবে?

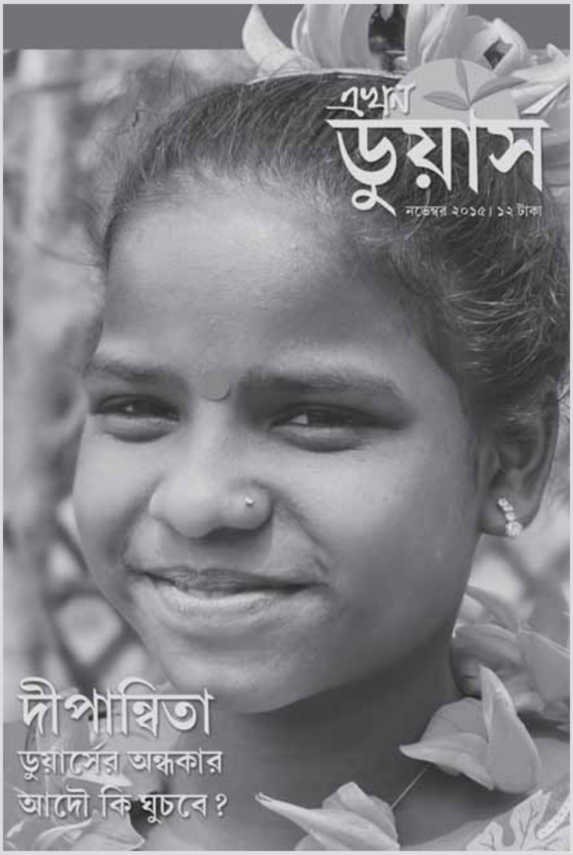


কে আর দেবে অঢেল আলো? কে আর দেবে ফুল?
বাগবাগিচার কান্না সবাই ভুলেছে বিলকুল!
দীপাবলির আলোর ছটায় ভাসছে সবার মন
আমার ঘরে লুকিয়ে তবু অবাধ অনটন।

বন আমাকে ফুল দিয়েছে, আকাশ দিল নীল
চা-বাগানের সবুজ আমায় শেখায় অন্ত্যমিল!
আমার হাসির সরল ফ্রেমে তোমার হাতের ক্লিক
অন্ধকারে তাও কেন যে ডুবছে চতুর্দিক!

বোনাস নিয়ে রাজনীতি হয়, কে কাকে দেয় ভেট
হঠাৎ হঠাৎ বন্ধ তবু চা-বাগানের গেট!
করম পুজোর মাদলটা হয় কান্না মেখে চুপ
বাইরে থেকে দেখতে থাকো বনবাগিচার রূপ!

ভেতর থেকে দেখতে যদি, বুঝতে চোখের জল
তোর্সা ডিমা তিস্তা তখন কাঁদছে অনর্গল!
এই মেঠো পথ ওই বুনো পথ এসব চিকন আল
অন্ধকারেই আজ রয়েছে, যেমন ছিল কাল!

**ছন্দে অমিত কুমার দে**
**ছবিতে গৌতমেন্দু রায়**

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

**দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৫**

## এই সংখ্যায়

### এখন ডুয়ার্স

গৌতমবাবু আপনি থাকছেন স্যার ৬
উদয়ন গুহর গাড়ি বদল সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে কি? ৮

### ডুয়ার্সে কালীমূর্তির নানা রূপ

পেটকাটি মাও : রহস্যাবৃত আজও ১০
নাগরাকাটায় কালী পুজোর পুরানো দিন ১১
পাতাল খনিতে কালী ১২
আমাদের ছোট্ট পাহাড় ১৩
মেটেলির দক্ষিণাকালী ১৪

### পর্যটনের ডুয়ার্স

ডুয়ার্সের পর্যটন উদ্যোগ প্রশংসনীয়
কিন্তু আদৌ কি জনমুখী হতে পেরেছে? ২১
জয়ন্তি টুরিস্ট লজ উদ্বোধন হলেও চালু হয়নি ২৩
ফের প্রচারের আলোয় আসুক ভুটানঘাট ২৩
সাইলি পর্যটনকেন্দ্রের কাজ কি শুরু হবে? ২৪
নতুন ঠিকানা মাগুরমারি ২৫
পশ্চিম ডামডিমে ইকো লজ প্রস্তুত ২৫
সরকারি টুরিস্ট লজগুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিষেবার ব্যবস্থা হোক ২৬

### ধারাবাহিক

উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-বাগানের সমস্যা বুঝতে ইতিহাসে ফেরা দরকার ১৫
ছিটমহলঃ তিন বিঘা লিজ চালু হতেই বাড়ল ভূমিদস্যুদের অত্যাচার ২৬
তরাই উৎরাই ৩০
বসন্তপথ ৩৩

### নিয়মিত

ডাকে ডুয়ার্স ৪
ডুয়ার্সের গল্প ৩৯
পাঠকের ডুয়ার্স ৪২
ডাক্তারের ডুয়ার্স ৪৪
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৫
ডুয়ার্সের মুখ ৪৭
প্রহেলিকার ডুয়ার্স ৪৭

**সম্পাদক** প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
**কার্যনির্বাহী সম্পাদক** তপন মল্লিক চৌধুরী
**অলংকরণ** দেবাশিস রায়চৌধুরী
**সার্কুলেশন** দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
**বিজ্ঞাপন সেলস** সুরজিৎ সাহা
**বিপণন দপ্তর** বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
**মুদ্রণ** অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

# জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে দীপাবলী ও ছটপুজোর শুভেচ্ছা

জলপাইগুড়ি মাতে দীপাবলী সাজে।
পাশে আছে পুরসভা, রত তার কাজে।
কত শত বাজি পোড়ে, কত রোশনাই।
পথে মানুষের ঢল, যেন শেষ নাই।।
ছোটরা পাহাড় গড়ে আনন্দে মাতে।
মন্ডপে এলো কালী ঢাক-ঢোল সাথে।।
করলার দুই ধারে জোর দীপাবলী।
পুরসভা ঠিক রাখে পথ-ঘাট-গলি।।
এরপরে ছট পুজো, আনন্দ হাট।
পুরসভা সাজিয়েছে করলার ঘাট।।
মা-মাটি-মানুষের মূল কথা বলি।
এবার শহরে যেন নব দীপাবলী।।

কার্টুন : সি শুভ্রম

# এলোমেলো করে দে মা, লুটেপুটে খাই

দুম দমাস, ফট ফটাস, দাম গদাম। দুর্বৃত্তের দৌরাত্ম্যে নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে উর্দিধারী কনস্টেবল। পাছে পেটোবাজির পরিণামে পরানটা পাংচার হয়ে যায়। মাগো, যে ক'টা দিন চাকরি আছে, কোনওরকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই হল, আর কখনও যেন এমুখো না হতে হয়! কনস্টেবলটি বিলক্ষণ জানে, শাসকের কাছে তাদের 'ফোর্স' দাসখত লিখে দিয়েছে বহুদিন আগেই। নগরপালকে তাদের মতো কনিষ্ঠ গোপালরা মিলে যে দিন বেল্ট-পেটা করেছিল, সম্ভবত সেই দিন থেকেই। তারপরও তো তাদের উর্দির রং সেই একই আছে, বদলে গিয়ে লাল থেকে নীল হয়ে যায়নি! অতএব চলে আসা পুরানো নিয়মের যে ব্যতিক্রম ঘটবে, তার কোনও কারণ নেই! তাই তো ছাত্র সংসদ কিংবা সংসদ নির্বাচনের দিন নির্বিকার বসে 'নির্বিঘ্নে' ভোট দেখে তারা, একে অপরকে হেসে বলে, এ তো ছেলেবেলায় নিজেরাই কত করেছি! না হলে কি আর এই চাকরিটা পেতাম!

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাড়ির কিশোরী মেয়েটি সময়ে বাড়ি না ফিরলে কিংবা ছেলেটির মোবাইল সুইচ অফ পেলে অজানা আশঙ্কায় বুক কেঁপে ওঠে সেই কনস্টেবলটিরও। ডিউটি শেষ করে যত দ্রুত সম্ভব ভিড়ে ঠাসা বাসে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে সে। পাড়ার মোড়ের ক্লাবে অভব্য আড্ডার বহর দেখে গা ঘিনঘিন করে ওঠে তারও। অক্ষম ক্রোধে দাঁত কিড়মিড়ি করে আর মনে মনে ভাবে, তার প্রতিবেশী সাধারণ মানুষটি আজ সত্যিই কত অসহায়!

অথচ তেমনই নিরুত্তাপ চলে ডুয়ার্সের জীবনযাত্রা, যুগের পর যুগ পিছিয়ে পড়লেও কোনও খেদ নেই। কান পাতলে হয়ত শোনা যায় চা-বাগান থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ, কিন্তু তা শোনার মতো ধৈর্য কোথায় বাকি পৃথিবীর? কান্না তো এখানে হিংসার আগুন জ্বালাতে পারে না, দীপাবলির আলো বরং যেন অন্ধকারকেই ডেকে আনে বেশি। মানুষ এখানে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। প্রতিযোগিতার আঁচ তাকে ছুঁতে পারে না। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা। শিল্প নেই, কৃষি নেই, কাজের সংস্থান নেই, তবু প্রতিবাদ নেই, বিরোধ নেই, হিংসা নেই, তাই কোনও খবরেও স্থান নেই। সেই অজানা দ্বীপবাসীদের মতোই আধো ঘুমে আধো জাগরণে দিন কাটায় এখানকার ভোটাধিকার ক্ষমতাসম্পন্ন জনগণ। সেই সুযোগে লুটপাট চলে তাদের প্রাপ্য সম্পদে ও অধিকারে।

তবু আদিবাসী কিশোরীটি আজও নির্মল হাসে, মাথায় গলায় বুনো ফুল গুঁজে জঙ্গলের চেনা পথে হেঁটে বেড়ায় হরিণীর মতো। সেই গোবেচারা কনস্টেবলটি তাকে আদৌ চেনে না, চেনবার কথাও নয়, অথচ তাও করজোড়ে অস্ফুটে প্রার্থনা করে, ভালো থেকো, ভালো রেখো মাগো, আবার এসো।

# আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই প্রয়োজন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ

বিশাল ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ। এর উত্তরাঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র, জলবায়ুর তারতম্য ও মাটির বিভিন্নতার ফলে সৃষ্টি হয়েছে বনাঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ যার মাঝে ছড়িয়ে আছে বর্ণময় বৃক্ষলতা, গুল্ম আর বন্যপ্রাণী। এই অরণ্যময় পরিবেশকে জীবন্ত করেছে বিরল প্রজাতির লালপান্ডা, বৃহৎ কাঠবিড়াল, অসংখ্য পাখি ও বিচিত্র সরীসৃপ। তৃণভূমির জঙ্গলকে আরও সমৃদ্ধ করেছে একশৃঙ্গী গন্ডার, গাউর (বাইসন) বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী হস্তী, নানা জাতের হরিণ, চিতাবাঘসহ নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীকূল। এ সবেরই সমাহার ঘটেছে বন্যপ্রাণ বিভাগ, উত্তর মন্ডলের অন্তর্গত গরুমারা, ন্যাওড়াভ্যালি, সিংহলীলা ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং চাপড়ামাড়ি, মহানন্দা ও সিনচল অভয়ারণ্যে। পাশাপাশি লাটাগুড়িসহ কয়েকটি প্রকৃতিবীক্ষণকেন্দ্র, দার্জিলিঙের মিউজিয়াম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকৃতির নানা অবদান সম্পর্কে মানুষের অদম্য জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানকে পরিশীলিত করছে।

মানুষের অন্তহীন চাহিদা, অর্থলিপ্সা এবং ক্রমবর্ধমান চাপে আজ বনকুল ধ্বংসের সম্মুখীন— তার প্রভাব প্রাকৃতিক নিয়মেই বন্যপ্রাণী ও পক্ষীকূলের উপর নেমে এসেছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ, কৃষিক্ষেত্রের বিস্তার, শিল্প সম্প্রসারণ ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আজ সংকুচিত হয়ে চলেছে বনাঞ্চল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও মানবজাতির স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের দিকে তাকিয়ে আমাদের সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার প্রয়োজনে। আসুন সবাই মিলে শপথ নিই আগামী প্রজন্মের স্বার্থেই প্রকৃতির এই অফুরন্ত সম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার।

**বনপাল**
**বন্যপ্রাণ উত্তর মন্ডল**
**জলপাইগুড়ি**

জনস্বার্থে প্রচারিত

# গৌতমবাবু আপনি থাকছেন স্যার

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী গৌতম দেবের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কি অনিশ্চিত? তখনও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভোটের রায় গণনা পুরোপুরি শেষ হয়নি, মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিত পুরমন্ত্রী কলকাতায় বসেই জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়িতে স্থানীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণেই আমাদের দলের খারাপ ফল হয়েছে। ফিরহাদ হাকিমের ওই বক্তব্যের পরই নানা রাজনৈতিক মহলে ধরে নেওয়া হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক কফিনে বোধ হয় শেষ পেরেক পোঁতার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান কার্যালয়ে তখনও বসে দার্জিলিং জেলার তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি। রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর তথাকথিত শিলিগুড়ি মডেলের দমকা হাওয়ায় একের পর এক পর্যুদস্ত হচ্ছে তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। টিভির পর্দায় সেই ছবি ভেসে উঠতে দেখছেন গৌতম দেব। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার পারদ নামছে-উঠছে ঘন ঘন। এরকম সময় মন্ত্রীসভায় সহকর্মীর মুখ থেকে নিঃসৃত হল ওই মন্তব্য। কালবিলম্ব করেননি গৌতমবাবু। হাওয়া কোন দিকে ঠাহর করতে না পেরে টিভির রিমোটের পাওয়ার অফ করে দেন। দলের প্রধান কার্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দুপুর একটার মধ্যে বাড়ি ফিরে গেলেন তিনি। এই ঘটনার পর প্রায় এক মাস অতিবাহিত। ইতিমধ্যে মহানন্দা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। গৌতম দেব কিন্তু আজও নিজ পদে আসীন বহুবিধ চাপ কাঁধে নিয়েই।

প্রথমে পুরভোট, তারপর মহকুমা পরিষদের ভোট— রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যর কৌশলে ধরাশায়ী তৃণমূল কংগ্রেস। এর পর যে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রীতিমতো ফুঁসবেন, তা আর বলে বোঝানোর কথা নয়। কেবল প্রশ্ন, বারবার কেন শিলিগুড়িতেই বিপর্যয় ঘটছে? একমাত্র শিলিগুড়ি বাদে আর প্রায় বাকি সব ক'টি সিপিএম ঘাঁটিতেই তৃণমূল কংগ্রেস সদর্পে থাবা বসাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু উত্তরে হাওয়ার দাপট যেন কিছুতেই তারা মোকাবিলা করতে পারছে না। শিলিগুড়িতে দলের এ ধরনের বিপর্যয়ের কারণ জানতে চেয়েছিলেন তিনি স্থানীয় নেতৃবৃন্দের কাছে। দলের শীর্ষনেতাদের সঙ্গেও শিলিগুড়ির বিষয়টি নিয়ে তিনি কলকাতায় বসে আলোচনা করেছেন। দল সুপ্রিমোর ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, কংগ্রেস, বিজেপি'র সঙ্গে গোপন আঁতাঁত করে সিপিএম যেভাবে শিলিগুড়িতে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা আরম্ভ করেছে, তা নিয়ে দলনেত্রী তাঁর সংশয় কিন্তু চেপে রাখছেন না। আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে শিলিগুড়িতে 'সিপিএম বধ'-এর ছকও নাকি তিনি কষতে শুরু করে দিয়েছেন।

**মহকুমা পরিষদ ভোটে দলের ভরাডুবিকে যতই গৌতম দেবের একার কাঁধে চাপিয়ে তাঁর অপসারণ দাবি করুন না কেন, এখনও পর্যন্ত দল সুপ্রিমো কিন্তু গৌতম দেবের বিরুদ্ধে কোনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। দলের সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা বললেও শিলিগুড়ি থেকে ছ'শো কিলোমিটার দূরত্বে বসে রাজ্যের পুরমন্ত্রীর মন্তব্যেও কিন্তু সরাসরি গৌতম দেবের নাম উচ্চারিত হয়নি।**

কিন্তু লক্ষণীয়, এখনও পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো গৌতম দেবকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করেননি। যদিও তাঁর কঠিন নজরেই রয়েছেন উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী। তবে এটাও সত্যি, শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ছ'শো কিলোমিটার দূরত্বে বসে রাজ্যের পুরমন্ত্রীর মন্তব্যেও সরাসরি গৌতম দেবের নাম উচ্চারিত হয়নি। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নির্বাচনে দলের পরাজয়ের পিছনে স্থানীয় নেতৃত্বের সাংগঠনিক দক্ষতাকে দায়ী করেই বার্তা দিয়েছিলেন তিনি। স্বভাবতই শিলিগুড়ির নেতাকর্মীদের একাংশ অবিলম্বে দলের জেলা সভাপতি বদলের দাবি তুলতে শুরু করেছিলেন। ফল প্রকাশের দিনই দলের জেলা কার্যকরী কমিটির এক নেতা তো বলেই দিয়েছিলেন, গৌতম দেব তো কারও কথাই শুনতে চান না। কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীকে দেখান। আর চলেনও নিজের খেয়ালখুশিমতো। ওঁর জন্যই দলের এই ভরাডুবি হল।

দম্ভ আর বদমেজাজের কারণে একাধিক অপ্রীতিকর অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটিয়েছেন গৌতম দেব। তাতে শুধু দলের নয়, তাঁরও নেতৃত্বের দুর্বলতা বারংবার প্রকাশ পেয়েছে। নেতা হিসেবে তাঁর ব্যর্থতার কথা বলতে গিয়ে শিলিগুড়ির নেতা-কর্মীদের একাংশ গৌতম

শিলিগুড়ির নেতাকর্মীদের একাংশ অবিলম্বে দলের জেলা সভাপতি বদলের দাবি তুলতে শুরু করেছিলেন। শিলিগুড়ি ভোটে দলের ভরাডুবির জন্য তাঁর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে, যিনি ওই জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্বপালনের যোগ্যতা রাখেন?

দেবের বদ মেজাজকেই দায়ী করেন। পুরমন্ত্রী সে দিনের মন্তব্যের পর উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, তাতেও খুব আশ্চর্য হয়েছিলেন শিলিগুড়ির তৃণমূল নেতাকর্মীরা। গৌতমবাবু কোনও রাখঢাক না রেখেই বলেছিলেন, পুরমন্ত্রী কী বললেন, তাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া আর কে কী বললেন, সেটাকে গুরুত্ব দিই না। তা ছাড়া পার্থ চট্টোপাধ্যায় কী বলছেন, সেটাও দেখা দরকার। শিলিগুড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু কর্মীর সরাসরি অভিযোগ, তাঁর স্পর্ধা, কর্মীদের সঙ্গে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে দুর্ব্যবহার করা, গোষ্ঠী কোন্দলকে প্রশ্রয় দেওয়া, ঠিকাদার এবং জমি মাফিয়াদের পঞ্চায়েতের টিকিট দেওয়ার জন্যই এমন ভরাডুবি হল। ক্ষুব্ধ কর্মীদের অভিযোগ, বুথ স্তর থেকে প্রার্থী বাছাই করতে বলা হলেও বস্তুত মন্ত্রীর অনুগতরাই টিকিট বিলি করেছেন। আর ফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে তাঁরা প্রায় সকলেই হেরেছেন। গৌতম দেবের ঘনিষ্ঠ এক তৃণমূল প্রার্থী গুলিবিদ্ধ হওয়ার 'নাটক' করে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষনজরে পড়েছিলেন। সেই প্রার্থী আর তাঁর স্ত্রী দু'জনেই হেরেছেন। উপরন্তু দেখা গেল, ওই এলাকা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ফল প্রকাশের পর গৌতম দেবের প্রথম ও প্রধান উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল, আমরা আগের চেয়ে অনেক ভাল ফল করেছি।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভোটের ফলাফল নিয়ে রাজ্যের পুরমন্ত্রীর মন্তব্যর পাশাপাশি তৃণমূল দলের পোড়খাওয়া নেতা এবং মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্য— শিলিগুড়িতে যেটা হয়েছে, সেটা হল নীতি-আদর্শের জলাঞ্জলি দিয়ে একটা হযবরল জোট। এটা ঘটনা যে, অশোক ভট্টাচার্য ওই ভোটের প্রায় সব ক'টি জনসভাতেই বলেছিলেন, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি— যার যেখানে জেতার সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে সেখানে ভোট দিন। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বামপন্থী রাজনীতির প্রেক্ষিতে এই ঘটনাকে লজ্জাজনক এবং নিন্দনীয় বলেছেন। কিন্তু এটাও তো মানতে হবে, একটি দল কবর থেকে উঠে এসে এ রাজ্যের একটি খণ্ডিত ভূমিতে ঘুরে দাঁড়াতে পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে, সেই মাটিকে তারা সমস্ত কৌশল দিয়েই মজবুত করার যে চেষ্টা করবে তা আর নতুন কী? অন্য দিকে এটাও সত্যি, মহকুমা পরিষদ ভোটে তাদেরই কাছে ধরাশায়ী তৃণমূল দলের ভোটের হার কিন্তু আগের চেয়ে বেড়েছে। তাই কলকাতায় বসে ফিরহাদ হাকিম কিংবা দার্জিলিং জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের একাংশ মহকুমা পরিষদ ভোটে দলের ভরাডুবিকে যতই গৌতম দেবের একার কাঁধে চাপিয়ে তাঁর অপসারণ দাবি করুন না কেন, এখনও পর্যন্ত দল সুপ্রিমো কিন্তু গৌতম দেবের বিরুদ্ধে কোনও কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। দলের শীর্ষনেতৃত্বে থাকা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ এখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভোটে ফলাফল নিয়ে মন্তব্যে গৌতম দেবের অপসারণের কোনও ইঙ্গিতও দেননি। এর পেছনে লুকিয়ে আছে যে কঠিন বাস্তব, সেটির অনুসন্ধান করাই শ্রেয়।

তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গের অঘোষিত মুখ্যমন্ত্রীর মুকুটে যতগুলি রঙিন পালক উপহার দিয়েছিলেন, তার অনেকগুলিই আবার তিনি নিজেই ফিরিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু দার্জিলিং জেলার দলীয় সভাপতির পদে গৌতম দেবের পরিবর্তে এই মুহূর্তে অন্য আর একটি মুখ তাঁর পক্ষে নির্বাচন করা খুব সহজ কাজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রেক্ষিতেই বলা যায়, যত সংখ্যক কর্মী, তার একটা বড় অংশই হল ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে যাওয়া সিপিএমের ছাঁট অথবা রাতারাতি লাল থেকে সবুজ আবির মাখা সুযোগসন্ধানী। অতএব তাঁরা যখন আজ দলের কোনও নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তাঁদের 'প্রত্যাশা'পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন নেতা।

আর নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্যি যে, গৌতম দেবের মতো নেতার সংখ্যাও তৃণমূল কংগ্রেস দলে অতি নগণ্য। সেখানেও ক্ষুব্ধ কংগ্রেস, সিপিএম ও বিজেপি থেকে আসার সংখ্যাটাই বেশি। তাঁদেরও তৃণমূলে যোগদানের উদ্দেশ্য, দীর্ঘদিন পুরানো দলে থেকে শীর্ষনেতৃত্ব পদ না পাওয়া অথবা নেতৃত্বে থেকেও মন্ত্রীর চেয়ারে বসতে না পারা। কার্যত এই বাস্তবতা দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও সত্য। আজ যাঁরা গৌতম দেবের বিরুদ্ধাচরণ করছেন, তাঁর অপসারণ দাবি করছেন, শিলিগুড়ি ভোটে দলের ভরাডুবির জন্য তাঁর ঘাড়ে দায়িত্ব চাপাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে এমন কাউকে কি খুঁজে পাওয়া যাবে, যিনি ওই জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্বপালনের যোগ্যতা রাখেন? তবে এমন অনেককেই পাওয়া যেতে পারে, যিনি জেলার কোনও একটি কলেজে ছাত্র রাজনীতি, বলা ভাল, কিছুদিন ইউনিয়নবাজি করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে তিস্তাপারের রাজনৈতিক বৃত্তান্ত অনুধাবন করা যেমন দুরূহ, তেমনই কঠিন পাহাড়-অরণ্য-গ্রাম-নগর মিশ্রিত এই ভূখণ্ডের রাজনীতিতে দলীয় পতাকাকে উত্তোলন করা।

আর শহর কলকাতার কোনও এলাকার নেতা, তিনি যদি সাংগঠনিক কাজে সফলও হন, তাঁর পক্ষেও ওই ভূখণ্ডের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়া কিংবা সংগঠনকে শক্তিশালী করা অসম্ভব কাজ। কারণ তাঁর পক্ষে নিজের এলাকার দুর্গোৎসবে নামী শিল্পী দিয়ে পাহাড় কিংবা অরণ্য সাজিয়ে মাত করে দেওয়া যত সহজ, ততটাই কঠিন সেই পাহাড় ও জঙ্গলের রাজনৈতিক কারবার। তাই এখনই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী কিংবা কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতির পদের প্রশ্নে দল সুপ্রিমো কোনও সিদ্ধান্তে যেতে চাইছেন না। পাশাপাশি এ কথাও ঠিক, গৌতম দেবের মতো পরিশ্রমী সংগঠকও তাঁর দলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের অন্যতম প্রধান হল তাঁর দম্ভ ও মেজাজ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও নেতা বা কর্মী, দল অস্বস্তিতে পড়েছে এমন কোনও দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেননি। অতএব তাঁর বিরুদ্ধে আনা দলীয় নেতা ও কর্মীদের অভিযোগগুলি মাথায় রেখে এখনই যদি তিনি সাংগঠনিক কাজে মনোযোগী হন তাহলে আগামী বিধানসভা ভোটের ফলাফলে যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাকে অনেকাংশেই অবাস্তব করে দিতে পারেন গৌতম দেব-ই। স্বভাবতই রাজ্য নেতৃত্বের নতুন সিদ্ধান্তের জন্য যাঁরা তাকিয়ে আছেন, তাঁদের আশা আপাতত পূরণ করতে পারছেন না দল সুপ্রিমো।

**তপন মল্লিক চৌধুরী**

# উদয়ন গুহর গাড়ি বদল সঠিক গন্তব্যে পৌঁছে দেবে কি?

প্রতিবেদনের নামকরণটি অনেক ভেবেচিন্তেই করতে হল। ফরওয়ার্ড ব্লকের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অতি সম্প্রতি তাঁর দল ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে পদত্যাগ করে হালভাঙা রাজনৈতিক নৌকাকে নোঙর করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পোতাশ্রয়ে। রাজনীতিতে দলবদল এখন আর কোনও নতুন ঘটনা নয়। রাজনৈতিক দলগুলি এখন আর আদর্শবোধের মঞ্চও নয়।

উদয়ন গুহ দলত্যাগ করে তৃণমূলের ঘরের দরজা দিয়ে আগেই ঢুকতে চেয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে জড়ো হয়ে থাকা ভিড়ের মানুষগুলি গুহবাবুকে হাসিমুখে সহ্য করে তাঁকে স্বেচ্ছায় জায়গা করে দিতে এগিয়ে এসেছেন বা আসবেন তা অবশ্য এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে জানা মুশকিল। তবে উদয়নবাবু তাঁর এই নতুন গৃহে পা গলাবার আগে দিদি মমতার মুখের স্মিত হাস্যের প্রশ্রয়ের চিহ্নটাকে দমদম বিমানবন্দরেই সাংবাদিকদের ক্যামেরার লেন্সের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন।

উদয়ন গুহর প্রসঙ্গে কিছু বলতে গেলে তাঁর পিতার নামটি উচ্চারিত হতে বাধ্য। কারণ আমাদের দেশের রাজনৈতিক অভিধানে 'পেটারন্যাল ডেমোক্রেসি' বা পিতৃতান্ত্রিক বা আরও পরিষ্কারভাবে বললে পরিবারতান্ত্রিক গণতন্ত্র শব্দটি নতুন নয়। ভারতের ইতিহাসের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে তাই তার ব্যাটনকে তুলে দিতে হয় নেহরু পরিবারের কোনও সদস্যের হাতে। সমাজবাদী দলের নেতৃত্বে বদল ঘটাতে হলে আমেরিকা থেকে মুলায়ম সিং যাদবের পুত্র অখিলেশ যাদবকে উড়িয়ে আনতে হয়। কাশ্মীরের ঐতিহ্য রক্ষা করতে ভাবতে হয় শেখ আবদুল্লার পরিবারের কোনও সন্তান অথবা মুফতি মহম্মদ সৈয়দের কোনও আত্মীয়কে। উত্তরপ্রদেশের জাঠ দলের পরিচয়কে ধরে রাখতে সেই দলের দণ্ডকে তুলে দিতে হয় চৌধুরি চরণ সিং-এর পুত্র অজিত সিং-এর হাতে। পশ্চিমবাংলার সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের লাখো লোকের ভাবনার উত্তরাধিকারীর রূপ দিতে তাই মঞ্চে আনতে হয় কোনও 'ভাইপো'কে। অনেকটা সূর্যের আলো না থাকলে যেমন গ্রহ-জগৎ থাকে অন্ধকার, তেমনই পিতৃপরিচয় না দিলে এঁরাও থেকে যান অজ্ঞাত।

তেমনই উদয়ন গুহ কোনও রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ারের অবগাহনে রাজনৈতিক প্রাঙ্গণে নিজের জায়গা করে নেননি। তিনি এই প্রাঙ্গণে এসেছেন তাঁর পিতার পরিচয়ের আঙুল শক্ত করে ধরে রেখে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কোচবিহার জেলায় কিন্তু কংগ্রেসের আগেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সেই দলের উদ্যোক্তা ছিলেন কুড়িগ্রামের নরেশচন্দ্র পাল ও প্রবোধচন্দ্র পাল।

কোচবিহারে বস্তুতপক্ষে, বিশেষ করে দিনহাটায় ফরওয়ার্ড ব্লকের যাত্রা বেরুবাড়ি হস্তান্তর বিরোধিতার আন্দোলনের মধ্যে। কমল গুহ সেখান থেকেই উঠে আসেন রাজনৈতিক মঞ্চে। সে দিনের আন্দোলনের তীব্রতা এতখানি ছিল যে, ১৯৬২ সালের ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে সিপিআই জোটবদ্ধভাবে যে নির্বাচনী আঁতাঁত গড়েছিল, তাতে ফরওয়ার্ড ব্লক ও কমিউনিস্ট পার্টি যথাক্রমে ৫টি ও ১টি আসনে জয়লাভ করে, কংগ্রেস পায় মাত্র মাঠভাঙা আসনটি। এই ফলাফল ফরওয়ার্ড ব্লককে কোচবিহার জেলায় প্রধান রাজনৈতিক দলের মর্যাদা দেয় এবং কমল গুহ হয়ে ওঠেন এই দলের প্রধান মুখ। ফরওয়ার্ড ব্লক সম্বন্ধে ঠাট্টা করে বলা হত, সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক, বন্ধনীর মধ্যে দিনহাটা।

এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য, যা ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসের বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে হাজির করা যেতে পারে।

সে দিন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার ছিলেন কেশবচন্দ্র বসু। তিনি কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বিধানসভায় এই তথ্য পেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক কমল গুহ উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে যে কমিউনিস্ট অ্যারেস্ট করা হল, এত দেরিতে কেন করা হল? সেই যখন করলেন, আগে কেন করা হয়নি? যাঁরা কমিউনিস্টদের নিচের তলায় আছেন, যাঁরা রেস্টুরেন্টে, সিনেমায়, মাঠে, ঘাটে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন, চিনের পক্ষে, তাঁদের আজ পর্যন্ত কেন অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না?'

তথ্যটি জানানোর প্রয়োজন ছিল। আজকে যে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেন, ভারত-চিন মৈত্রী সমিতি গঠন করে চিন ভ্রমণে যান, তাঁরা এককালে কিন্তু কমিউনিস্ট বিরোধিতাকেই তাঁদের নীতি বলে মনে করতেন। আজ উদয়ন গুহ সেই বামপন্থী বলে ঘোষিত ফরওয়ার্ড ব্লক ছেড়ে দক্ষিণপন্থী দল তৃণমূল কংগ্রেসে

আগামী নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এবার মন্ত্রীসভায় জায়গা পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিন্তু আরও তীব্র। পুরানো তৃণমূলিরা এই নব্য তৃণমূলিদের কতখানি জায়গা দেবে সন্দেহ।

যোগ দিলে তিনি আদর্শগত মঞ্চ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বলে বলা ঠিক নয়। বরং বলা যায়, তিনি কোনও দিনই বামপন্থী আদর্শকে বিশ্বাস করেননি। তবে ৩৪ বছর ধরে বাম-শাসকের ছত্রছায়ায় থেকে ক্ষমতার কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হওয়াকে কেউই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেননি। একটা ক্ষোভ তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পিতা কমল গুহ নানা টানাপোড়েনের মধ্যে দল ছাড়লেও বামফ্রন্টের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছেন। মন্ত্রীও ছিলেন। পিতার রাজত্বকালে উদয়নবাবু কৃষিবীজ খামারের ঘটনায় নানা দুর্নীতির প্রশ্নেরও সম্মুখীন হয়েছিলেন। হয়ত ধরে নিয়েছিলেন বামফ্রন্টের মন্ত্রীসভায় দলের পক্ষ থেকে তাঁর জায়গা হবে। ফরওয়ার্ড ব্লকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তাঁর সেই স্বপ্নপূরণ হয়নি। আগামী নির্বাচনে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবে এমন সম্ভাবনা আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। বরং তৃণমূল ক্ষমতায় এলে এবার মন্ত্রীসভায় জায়গা পাবেন বলে প্রতিশ্রুতি পাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছে। তবে মনে রাখতে হবে, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কিন্তু আরও তীব্র। পুরানো তৃণমূলিরা এই নব্য তৃণমূলিদের কতখানি জায়গা দেবে, সেখানেও আছে সন্দেহ। ভরসা একটাই, তৃণমূল সংগঠনটি নেত্রীকেন্দ্রিক সংগঠন। তাঁর ইচ্ছাই শেষ কথা। তা সত্ত্বেও বিধানসভায় তাঁর প্রবেশের দরজা তৃণমূলের পুরানো সদস্যরা এবং বামফ্রন্ট তথা ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে যাওয়া উদয়ন গুহ বিরোধী গোষ্ঠীরা কিন্তু গোপন আঁতাতে আটকে দেবার চেষ্টা করতে পারেন।

উদয়ন গুহর এই রাজনৈতিক গাড়ি বদলের ঘটনাটি সাধারণ মানুষ কেমনভাবে নেবেন, সেটাও কিন্তু ভাবতে হবে। নেতারা যখন এক দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন তাঁরা ভোট প্রার্থনা করেন দলের আদর্শের কথা ভেবে। নির্বাচনের পরে ধরে নেন, ভোটদাতারা তাঁকে দেখেই, তাঁর সমর্থনেই ভোট দিয়েছেন, সেই ভোট জেতার পেছনে দলের পরিচয় বা আদর্শের কোনও কারণ নেই। তাই দলবদলের ক্ষেত্রে শেয়ার বাজারের রিপোর্টের মতন রাজনৈতিক, বাজারে তেজি-মন্দার খেলা। দলীয় আনুগত্য ভোটদাতাদের কাছে প্রতিশ্রুতি— সব কিছুই হয়ে পড়ে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে মন্ত্রপাঠের মতো। সেই মন্ত্র তো মানুষের জন্য নয়, উচ্চারণেই যেন পুণ্য। জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতিদানের জন্য সব দলই মুক্তকচ্ছ। তাই দলবদলের জন্য তাঁরা প্রতিশ্রুতিভঙ্গের কথা মাথায় আনেন না, বরং যুক্তি তোলেন প্রতিশ্রুতিপূরণের মহৎ সংকল্প নিয়েই তিনি দল বদল করেছেন।

মাত্র ক'দিন আগেই উদয়নবাবুকে দেখা যেত বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রায় প্রতিদিনই বামফ্রন্টের হয়ে তৃণমূল কত মারাত্মক দল, তার প্রমাণে গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করতে। এবার অবশ্য সেই চ্যানেলগুলিতে তিনি বলার জন্য যে ডাক পাবেন এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ কিছু চ্যানেল তাদের নীতিগত ভাবনায় তৃণমূল বিরোধীদের সেখানে মুখ দেখানো সুযোগ করে দিত। কিছু চ্যানেলে তৃণমূলের হয়ে এতদিন যাঁরা মুখ দেখাবার সুযোগ পেয়ে এসেছেন, তাঁরা স্বভাবতই নব্য তৃণমূলিদের সেই জায়গাটা ছেড়ে দিতে রাজি হবেন না।

এবার কী বলবেন উদয়নবাবু? এতদিন তো একটা কথা চালু ছিল— 'বদলে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা', এখন তো উদয়বাবুকে বোঝাতে হবে তাঁর মতটা আর পথটা আসলে কী ছিল? লোকে কিন্তু ধরে নিতে পারে, আসলে মত ও পথটার কথা যা তিনি এতদিন বলে এসেছিলেন, তার পেছনে ছিল না কোনও আদর্শবোধ। সেটা ছিল প্রয়োজনসিদ্ধির কায়দা। আর এই কায়দা খাটাতেই এই দলবদলের মেহনত। অবশ্য এই মেহনতের জন্য প্রয়োজন পাটোয়ারি বুদ্ধির খেলা। সেটা ধরে নেওয়া যেতে পারে, তাঁর বাবার জোরে বীজ খামার কেলেঙ্কারিতে তিনি হাত পাকিয়ে নিয়েছেন।

এ দেশে দলবদল, ভোলবদল, অন্য দলে ভিড়ে যাওয়া কোনও লজ্জার নয়। তার প্রধান কারণ, কোনও দলেরই আদর্শের প্রতি নীতিনিষ্ঠ থাকার প্রয়োজন অনুভব করা হয় না। ক্ষমতাই এখানে আদর্শ, তাই এখানে চলে আইনসভা তথা রেল জংশনের প্রতীক্ষালয় থেকে গাড়ি বদলের দৌড়। তবে গাড়ির গন্তব্যস্থল না খোঁজ করেই এ গাড়ি বদল সবসময় নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে না-ও দিতে পারে। উদয়নবাবু সঠিক গাড়ি বদল করেছেন কি না, তাতে সন্দেহ থেকে যেতে পারে।


## এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

**শিলিগুড়ি**
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
**শিবমন্দির**
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
**জলপাইগুড়ি**
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
**হলদিবাড়ি**
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
**মালবাজার**
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
**মালবাজার**
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
**চালসা**
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
**বিন্নাগুড়ি**
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
**বীরপাড়া**
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
**লাটাগুড়ি**
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
**ময়নাগুড়ি**
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
**ধূপগুড়ি**
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
**ফালাকাটা**
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
**আলিপুরদুয়ার**
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
**কোচবিহার**
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
**তুফানগঞ্জ**
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
**মাথাভাঙা**
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
**দিনহাটা**
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
**মালদা**
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
**রায়গঞ্জ**
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
**৯৮৩০৪১০৮০৮**

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
**০৩৩-২২৫২৭৮১৬**

# কালীমূর্তির নানা রূপ: ডুয়ার্সের ইতিহাসে 'মিসিং লিঙ্ক'

# পেটকাটি মাও রহস্যাবৃত আজও

পেটকাটি মাও, ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের পাশেই ব্যাংকান্দি গ্রামের এক রহস্যময় কৃষ্ণ পাথরের দেবীমূর্তি। রহস্যাবৃত এই দেবী কালী, চণ্ডী, নাকি তন্ত্রসাধনার কোনও যোগীমূর্তি? অনুসন্ধিৎসুদের মতানৈক্য থাকলেও এখানে স্থানীয় উদ্যোগে কালীমূর্তি ধরে নিয়েই এই পাথুরে দেবীমূর্তি পূজিত হচ্ছেন। তবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিবর্তনের রহস্যপথ ধরে এই 'পেটকাটি মাও'-কে হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের এক 'মিসিং লিঙ্ক' বলে ধরা যেতে পারে। খণ্ডিত বাংলার এই উত্তরাংশ বা তিস্তা বঙ্গের ইতিহাসের ধূসর অধ্যায়ে তন্ত্রসাধনার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা নিয়ে অদ্যাবধি পরিপূর্ণ গবেষণায় ঘাটতি রয়ে গিয়েছে। নিছক দেবীমূর্তির সাধন আরাধনার চর্চার খড়ির গণ্ডি অতিক্রম করে তাই ইতিহাসের ওই অনালোচিত প্রকোপে আলো ফেলা প্রয়োজন আজ। অভিমানী ইতিহাসেরও এই দাবি।

ময়নাগুড়ি শহর থেকে দেড় কিমি উত্তর-পূর্বের গ্রাম্য মেঠো পথের এক পাকদণ্ডীতে ছোট্ট বাহুল্যবর্জিত এই পেটকাটি মাওয়ের মন্দির। কিছুদিন আগেও এটি ছিল নিছকই বেড়ার ঘর ও টিনের ছাউনি দেওয়া। আজ ইটের দেয়াল উঠলেও প্রায় অরক্ষিত এই অমূল্য কষ্টিপাথরের দেবীমূর্তিটি।

হিমালয় সন্নিহিত এই বাংলার ধর্মাচার, কৃষ্টি বা প্রত্ন গবেষকরা এই অনন্যা মূর্তিটির উল্লেখ করেছেন বারংবার। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গোটা উত্তরবাংলার প্রত্ন গুরুত্বের মূর্তিগুলোর শীর্ষভাসে থাকার দাবি রাখে এই 'পেটকাটি মাও'। 'পেটকাটি মাও কালী'— এই অদ্ভুত নামে রাজবংশী সমাজে পূজিত এই দেবীমূর্তিটির এমন নামের কারণ তার শরীরী গঠনশৈলী। অর্থাৎ যে দেবীর পেটকাটা, তিনিই পেটকাটি মাও। কিন্তু এটি কালীমূর্তি কি না তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা একে কালীমূর্তি বলেই পুজো করছেন। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় শ্যামা পুজোর সময় একে ঘিরে থাকা কৃষিগ্রাম রীতিমতো মেতে ওঠে উৎসবে। দূরদূরান্ত থেকে রাজবংশী মানুষজন এখানে এসে ভক্তি অর্ঘ্য দেন। পাশেই বয়ে চলেছে প্রায় মজে আসা নদী। অদ্ভুত নাম এই নদীটির— 'মরা গাওয়া'।

'রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল'-এ ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল একে চামুণ্ডাচণ্ডী বলে উল্লেখ করেন। চারুবাবুর মতে ভদ্রেশ্বরী দেবী হিসেবে পূজিত এই দেবী আসলে চামুণ্ডা। কেউ কেউ পেটকাটি মাওকে ধূমাবতী বলেও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ডাঃ গিরিজাশংকর রায় তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজাপার্বণ'-এ এই অভিমতের বিরোধিতা করেন। ধূমাবতীর উল্লেখ যে সমস্ত গ্রন্থে বা তন্ত্রে পাওয়া যায়, তার কোনওটির সঙ্গেই পেটকাটির মাওয়ের চেহারার কোনও মিল লক্ষ করা যায় না।

পেটকাটি মাও ধূমাবতী চামুণ্ডা নয়, চণ্ডী বললেও তা গ্রহণীয় হয় না।

ওড়িশার বীরপুর এক উল্লেখযোগ্য তন্ত্রক্ষেত্র। সেখানে প্রাপ্ত এক যোগিনীমূর্তির সঙ্গে খুবই সাযুজ্য পাওয়া যায় পেটকাটি মূর্তির। এখানে পেটকাটি মাওয়ের মতোই মূর্তিটির উদর গহ্বরে ঢুকে আছে, অস্থিচর্মসার শরীর। গলায় মুণ্ডমালা এবং দুই হাতে মাথার উপরে তুলে ধরা ব্যাঘ্রমূর্তি (পেটকাটির হস্তীমূর্তির মতোই), পায়ের নিচে শিশুমূর্তির বদলে যদিও এই হীরাপুরের মূর্তিটির পায়ের নিচে ছাগমূর্তি। এই মূর্তিটিই শুধু নয়, স্তম্ভিত হতে হয় উত্তরপ্রদেশের লোখারিতে প্রাপ্ত যোগিনী চামুণ্ডামূর্তির সঙ্গে এর মিল দেখে। ভয়ালতা, বসার ভঙ্গি যাবতীয় দেখে যেন মনে হয়, একই শিল্পী একই ভাবনায় পাশাপাশি দুই তন্ত্র যোগিনীমূর্তি রচনা করেছেন। এই মূর্তিটি ৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট অর্থাৎ পেটকাটির থেকে ফুটখানেক ছোট। মূর্তিটি একই রকম, অস্থিচর্মসার, পায়ের নিচে নরশিশুমূর্তি, দু'হাতে মাথার উপর তুলে ধরা হস্তীমূর্তি। তবে সামনে রয়েছে পানপাত্র। দু'জনেই ত্রিনয়নী। উত্তরপ্রদেশের বান্দ্রাতে পাহারচূড়ায় এই লোখারা গ্রাম। এখানে ২০টি মূর্তি পাওয়া গেছে। লোখারার যোগিনী

পেটকাটি মাওয়ের মূর্তি কবে থেকে এই ব্যাংকান্দি গ্রামে পূজিত হচ্ছেন তা নিয়েও বিতর্ক আছে। তবে দীর্ঘদিন এটি জঙ্গলে ও মাটির নিচে পড়েছিল এটি জানা যায়। এই কারণেই গত শতকের গবেষক ও অনুসন্ধানকারীদের লেখা বা রিপোর্টে এর উল্লেখ দেখা যায়নি।

চামুণ্ডামূর্তিটির সঙ্গে পেটকাটি মূর্তির সাযুজ্য কি কোনও মিসিং লিঙ্ক-এর দিকে আঙুল তুলছে?

১৯৬৮ সালে শিলিগুড়ির বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে একটি অনুসন্ধানকারী দল ময়নাগুড়ির দেবদেবী ও মন্দিরগুলোর সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। এই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন কৈলাসনাথ ওঝা। বিবরণী অনুযায়ী মূর্তির বাহ্যিক রূপ দেখে একে রাজবংশী মানুষরা 'পেটকাটি মাও' নাম দেন।

রাজবংশীগণের রাজপরিবারগুলির ইতিহাসে এই মূর্তির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে কি এই মূর্তিটি বাহির হইতে আমদানীকৃত?

পেটকাটি মাওয়ের মূর্তি কবে থেকে এই ব্যাংকান্দি গ্রামে পূজিত হচ্ছেন তা নিয়েও বিতর্ক আছে। তবে দীর্ঘদিন এটি জঙ্গলে ও মাটির নিচে পড়েছিল এটি জানা যায়। এই কারণেই গত শতকের গবেষক ও অনুসন্ধানকারীদের লেখা বা রিপোর্টে এর উল্লেখ দেখা যায়নি। বিংশ শতকের মাঝামাঝি এটি পুনরায় বিস্মৃত হয়। এ বিষয়ে আমগুড়ির পূর্ববড়গিলা গ্রামের ললিতমোহন রায় জানিয়েছেন, ১৯৪৮-এর শেষে এটি আবিষ্কৃত হয়। শ্রীরায় সে সময় ময়নাগুড়ি হাই স্কুলের ছাত্র। এই তন্ত্রসাধক এবং শিক্ষক সে সময় ওই অঞ্চলে স্কুলের কিছু ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে খোঁজাখুঁজি চালান। আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অশীতিপর প্রাক্তন এই সচিবের স্মৃতিতে সেই শিক্ষকের সাধক নামটি ধরা না থাকলেও ঘটনার বর্ণনা শোনান তিনি। মরাখাওয়া নদীর পার্শ্ববর্তী নিচু জমিটি তখন ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। শিক্ষকের নির্দেশে তারা কোদাল দিয়ে স্থানটি খোঁড়া শুরু করে। মাটির কিছুটা নিচে বালুর আস্তরণে চাপা পড়ে ছিল মূর্তিটি। সে সময় কোদালের মুখেই বেরিয়ে আসে মূর্তিটি, কোদালের আঘাতে ডান দিকের হাতটিও ভাঙে। মূর্তি তুলে তখন পরবর্তী বাড়িতে রাখা হয় কিছুদিন, তারপর ওই গর্তের মতো নিচু স্থানেই তা রেখে পুজোর আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে যদিও তাকে গর্ত থেকে তুলে বর্তমানের বেদিমূলে স্থাপন করা হয়েছে।

মূর্তিটির সাড়ে সাত ফুট উচ্চতা, দৈর্ঘ্যে ২ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্তরের স্থূলত্ব ৭.৫ ইঞ্চি। কালো কষ্টিপাথরের মূর্তিটি দশভুজা। বাঁ দিকে পাঁচটি হাত, একটিতে হস্তী, একটি ঘণ্টা, একটি ছিন্ন নরমুণ্ড ও একটি নরমূর্তি আছে। অপরটি ভাঙা। ডান দিকেও অনুরূপ পাঁচটি হাতের একটি উপরের হস্তীর মুখের দিক ধরে আছে, একটি কঙ্কাল, একটি বাদ্যযন্ত্র আছে, অপর দু'টি হাতই ভাঙা।

অলংকরণ: সর্পনির্মিত কর্ণাভরণ, সর্পশোভিত মুকুট, গলায় নরমুণ্ডমালিকা, সর্বাঙ্গে সর্পমালার সজ্জা। অস্থিচর্মসার শরীরে উদরটি গহ্বরাকৃতি, যেখানে শিরদাঁড়ার সমান্তরাল উপরিভাগে একটি বৃশ্চিক নিভৃতভাবে নির্মিত। দু'টি বিস্ফারিত চোখ ছাড়াও কপালে আরও একটি চোখ (ত্রিনয়ন), পয়োধর ঝুলে পড়া। পায়ের নিচে একটি ছোট নারীমূর্তি। একপাশে শৃগাল, অপর পাশে পেঁচার মূর্তি। রহস্যের কুয়াশা ভেদ করে এই সঠিক উৎসের খোঁজ করতে এগিয়ে আসুন কোনও গবেষক, এই আকাঙ্ক্ষা যেন মূর্তির আবহে গুঞ্জরিত হচ্ছে।

**গৌতম গুহ রায়**
**ছবি: অমিতেশ চন্দ**

# নাগরাকাটায় কালী পুজোর পুরানো দিন

আমাদের বাড়ির উঠোন ঘেঁষে রাস্তার ধারে একটা বড় বট গাছ ছিল, পাকা সড়কের পাশে। উঠোনের পাশের কাঁচা রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে জলঢাকা রেল ব্রিজ পর্যন্ত। আমি বলছি ছয়ের দশকের শেষ দিকের কথা। এখনকার মতো এত ঘরবাড়ি ছিল না। আমাদের বাড়ির বারান্দায় বসলে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যেত। সন্ধেবেলা বারান্দা থেকে দূরে চামুর্চি বাজারের সার সার আলোকবিন্দু দেখা যেত। আমাদের বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণে জাদুকুঠি। তার ঠিক নীচ দিয়ে পাহাড় ঘেঁষে ট্রেন চলাচল দেখতে পেতাম। এখন চারপাশে বাড়িঘরের আধিক্যে কিছুই দেখা যায় না। সব কিছু ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সব কিছু পালটে গিয়েছে। হারিয়ে গিয়েছে অনেক কিছু। যেমন হারিয়ে গিয়েছে আমাদের বাড়ির সামনের বট গাছের তলায় আদিবাসীদের সেই নাচ-গান।

বর্ষার শেষে ধান বোনা শেষ হয়ে গেলে আমাদের পাড়ার আদিবাসী পুরুষ-রমণীরা বট গাছের তলায় সন্ধ্যা সাতটা-আটটা থেকে প্রায় দশটা-সাড়ে দশটা অবধি নাচ-গান করত। তখন থেকেই বুঝতে পারতাম পুজো আসছে। তাদের এই নাচ-গান চলত একেবারে কালী পুজো পর্যন্ত। বট গাছটায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে নাচ-গান হত। আমার পিসেমশাইয়ের সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকান ছিল। তিনিই হ্যাজাকে তেল ভরে দিতেন প্রতিদিন। আমরা প্রতিদিন পড়াশোনা শেষে তাদের নাচ-গান দেখতাম।

ওই সময় নাগরাকাটায় আমাদের এলাকায় মাত্র দুটো কালী পুজো হত। একটা আমাদের সুখানি বস্তির নাগরাকাটা থানার পুজো, আরেকটা নাগরাকাটা মার্কেটের কালীবাড়ির পুজো। এই দুটো পুজোর মধ্যে নাগরাকাটা মার্কেটের পুজো একটু পুরানো। ১৯৬২ সালে নাগরাকাটা মার্কেটের পুজো শুরু হয়। আর নাগরাকাটা থানার পুজো শুরু হয় ১৯৬৩ সাল নাগাদ। ১৯৮২ সালে থানার মন্দিরটি পাকা করা হয়। থানার প্রতিমা মালবাজার থেকে ট্রাকে করে নিয়ে আসা হত। সে দিন বাড়িতে

আমিষ হলেও মা আমাকে দিতেন না, প্রতিমা আনতে যাব বলে। আমি '৭২/৭৩ সাল থেকে '৭৯ সাল অবধি প্রতিমা আনতে গিয়েছি। নাগরাকাটা থানার কালী পুজোর পরদিন বহিরাগত শিল্পীদের নিয়ে জমজমাট ফাংশন হত। ফাংশনে বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রচুর লোক আসত। অনেক রাত অবধি ফাংশন চলত। থানার কালী পুজোর দিন বেগুনপোড়াদাদু একটা বড় পোড়া বেগুন নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতেন। তিনি ওই বেগুনপোড়া দিয়েই পানীয় পান করতেন। তারপর মাথা দিয়ে নারকেল ভাঙতেন। তিনি নাগরাকাটা থানাতেই কর্মরত ছিলেন। কিন্তু খুবই পরিতাপের বিষয়, ১৯৮২ সালে তিনি নিজের বাড়িতেই খুন হয়ে যান।

একেবারে ছোটবেলায় মা-বাবার হাত ধরে পুজো দেখতে যেতাম। নয়-দশ বছর বয়স থেকে অবশ্য নিজেরাই যেতাম। মার্কেটের পুজোয় আমাদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রতিমা বানানো দেখা। আমাদের স্কুল বসত সকালে আর ছুটি হত সাড়ে দশটায়। স্কুল আর মার্কেট কাছাকাছি থাকায় আমরা স্কুল ছুটির পর প্রতিমা বানানো দেখতে যেতাম। এ ব্যাপারে মাতব্বর ছিল আমাদেরই বন্ধু অসিতাভ বসু, যাকে হেড স্যার 'মোড়ল' আখ্যা দিয়েছিলেন। আমরা এখনও ওকে মোড়ল বলেই ডাকি। এই প্রতিমা বানানোটা আমার কাছে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল।

বর্ষার শেষে আদিবাসী পুরুষ-নারীরা বটতলায় নাচ-গান করত। কালী পুজোর সপ্তাহখানেক আগে থেকে প্রায় ভোর অবধি নাচ-গান চলত। মাদলের তালে তালে আদিবাসী রমণীরা পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে, কখনও কোমরে হাত দিয়ে বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নাচত। মাদলে ময়ূরের পেখম লাগানো থাকত। মাথায় ময়ূরের পালক গোঁজা থাকত। আবার কখনও গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে একসঙ্গে সবাই ঝুঁকে পড়ে ঝাঁপতাল বাজাত, আবার সোজা হয়ে ঝুঁকে পড়ত। একসঙ্গে একটা ঝাঁই শব্দ হত, যার অনুরণন অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে যেত। অনেকটা পুকুরে পাথর ফেললে তরঙ্গ যেমন ছড়িয়ে যায়, সেইরকম ছড়িয়ে যাওয়া অনুভব হত। কিছুক্ষণ গানবাজনা হওয়ার পর লাঠি নাচ হত। ছোট ছোট লাঠি নিয়ে নারী-পুরুষ উভয়ে একবার ডান দিকের জনের লাঠির সঙ্গে ঠোকাঠুকি, একবার বাঁ দিকের জনের সঙ্গে লাঠি ঠোকাঠুকি করত। এইভাবে ডান দিক থেকে বাঁ দিকে বৃত্তাকারে গান গাইতে গাইতে নাচত।

কালী পুজোর পরদিন আরেকটা খেলা হত, যেটা হল নেপালি সম্প্রদায়ের ধাউসি খেলা। যদিও সেটা সর্বজনীন হয়ে উঠেছিল। আদিবাসী নেপালি, বাঙালি সবাই মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধাউসি খেলত। খেলাটা হল, প্রত্যেকের হাতে একটা করে লম্বা বাঁশের লাঠি থাকত। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে একজন বলত, 'আয়ো পুগিয়ো', বাকিরা সমস্বরে মাটিতে লাঠি ঠুকে বলত, 'বাউসিরীরাম'। গৃহস্বামী যতক্ষণ কিছু না দিচ্ছে— চাল, সবজি বা টাকা, ততক্ষণ ওই বাড়িতে ধাউসি চলবে। খেলাটা সন্ধ্যার পর হত।

আমি যখনকার কথা বলছি, তখনও বিদ্যুৎ আসেনি। প্রতিটি বাড়িতে ভূতচতুর্দশী ও কালী পুজোর দিন প্রদীপ জ্বলত। ঘোর অন্ধকার চারদিক, তার মাঝে মাঝে বিন্দু বিন্দু আলোর মালায় মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি হত। ওই আলোটুকু ছাড়া আর কোনও আলো নেই। প্রদীপ হাতে কেউ নড়াচড়া করলে শুধু তার মুখটুকু দেখা যেত। হিমেল হাওয়ায় প্রদীপের শিখাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠত।

তারপর পুজোর দু'দিন পর প্রতিমা নিয়ে আমরা নাচতে নাচতে জলঢাকা নদীতে বিসর্জন দিতে আসতাম। প্রতিমা ছিল শুধু দু'টি।

**নিঝুম ঠাকুর**
**ছবি: অজয় পাল**

# শ্যামা নয়, ভয়ংকরীর আরাধনাই চল

ডুয়ার্সে দুর্গাপুজোর তুলনায় কালী পুজোতেই মানুষের ঢল নামে বেশি। তবে ডুয়ার্সে বারোয়ারি কালী পুজোর রমরমা মেরেকেটে চল্লিশ বছর কি তার একটু বেশি। তার আগে এ পুজো ছিল মূলত মন্দির আর গেরস্থ বাড়িতে সীমাবদ্ধ। ডুয়ার্স বিচিত্র জনবসতি অঞ্চল। স্থানীয় রাজবংশীরা তো আছেনই, উপরন্তু ভুটান-তিব্বত-নেপাল-অসম থেকে মানুষ বহুদিন ধরে এখানে যাওয়া-আসা করছে। তারপরে ইংরেজ আমলে এসেছে সাঁওতাল পরগনার আদিবাসী। এইভাবে ডুয়ার্সে রকমারি ভাষা আর সংস্কৃতির মানুষ ঘুরে বেড়ায়।

ব্ল্যাক ম্যাজিক বলতে যা বোঝায়, তার অন্যতম ঘাঁটি হল তিব্বত, ভুটান, নেপাল আর অসম। এখনও চর্চা হয় পুরোদমে। প্রাকৃতিক পরিবেশ সদা অরণ্যময়, বৃষ্টিবহুল, কুয়াশামুখর হওয়ার কারণে এই চর্চা অক্সিজেন পেয়েছে। দেশের অন্য প্রান্ত থেকে লোক আসতে চাইত না, ফলে কালীর মতো দেবী, যিনি কালো জাদু আর তন্ত্রমন্ত্রের রহস্যময়তার সঙ্গে খাপ খেয়ে সমান ভয়ংকরী, তিনি এই অঞ্চলে পুজো পাবেন— এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। রাজবংশী মাশান দেবতার চেহারায়ও সেই ভয়ংকর রহস্যময় ব্যাপার ছিল। খুঁজলে এই অঞ্চলে অনেক ভয়ানক চেহারার দেবতা পাওয়া যাবে। তাই 'কালী' নামটা বাইরে থেকে এলেও তাঁর স্বরূপ এই অঞ্চলে অজানা ছিল না মোটেই। তাই কালীর ভীতিদায়ক চেহারার পুজো চালু ছিল এই অঞ্চলে। শাস্ত্রের চণ্ডীকে পরে পেয়ে মিলিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু বারোয়ারি পুজো হিসেবে কালী পুজো গত শতকের আটের দশক থেকে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। জলপাইগুড়ির মুনলাইট ক্লাব চন্দননগর থেকে আলোকসজ্জা এনে গোটা ডুয়ার্সে বিখ্যাত হয়ে ওঠার পর বারোয়ারি কালী পুজোর ধুম পড়ে যায়। তার আগে সে পুজো হত মূলত দুর্গা পুজো কমিটি মঞ্চে। দুর্গাকে পুজো করলে কালীকে করতেই হবে— এই নিয়মের কারণে। আর ছিল গুটিকয় পাড়ার পুজো। পুজোর পরদিনই ঠাকুর বিসর্জন।

কিন্তু আলোকসজ্জার কারণে একদিন পুজো করাটা হয়ে উঠল অপর্যাপ্ত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অবধি টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল পুজো কমিটিগুলি। দুর্গার মতো ঝামেলা নেই যে যতদিন থাকবে, পুজো করতে হবে। ফলে খরচ বাঁচল, আবার ঠাকুরও থাকল। উক্ত আটের দশক থেকে গত শতকের শেষ অবধি জলপাইগুড়ি শহরে কালী পুজো প্রবল বাড়বাড়ন্ত লাভ করে। আলো ছাড়াও কালী পুজোর প্রাঙ্গণ আর মণ্ডপকে ঘিরে আশ্চর্য সব ভাবনার পরিচয় বাস্তবতা লাভ করতে থাকে।

এর ফলে 'মাটির নিচে খনি' এবং তার মধ্যে কালীপ্রতিমা দেখা যায়। বিরাট মাঠে ভয়ংকর শ্মশান বানিয়ে সেখানে কালী এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রকে রাখা হয়। বিরাট মঞ্চে, ৩০ ফুট উঁচু পাহাড়ের সেটে অনুষ্ঠিত শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ দেখানো হয় একের পর এক হাউসফুল দর্শকের সামনে। ঘণ্টায় দু'বার। দেওয়ালির আগের দিন থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত চার দিন ভরপুর উৎসব। দুর্গা পুজোর সময় শহরের লোক পাড়ার মণ্ডপে কাটাতে পছন্দ করে। আর কালী পুজোয় চুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তবে কালী পুজোয় খানিকটা ভাটা এখন শহরে। অনেক ক্লাবের সদস্যরা বয়সের ভার টের পাচ্ছেন। উত্তরসূরির অভাবে বন্ধ হচ্ছে পুজো। চাকরি নিয়ে কত লোক চলে গিয়েছে শহর ছেড়ে অন্যত্র। ইতিমধ্যে ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি অনেক জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে বাঘা বাঘা সব কালী পুজো। শিলিগুড়িতে তো হয়েইছে। আগে কিছু মস্তান গোছের উদ্যোক্তা পুজো করতেন। এখন সেসব অতীত।

এই অবস্থায় ডুয়ার্সের প্রায় প্রতিটি এলাকার মতো জলপাইগুড়ি শহরেও প্রাচীন কালী পুজো খুঁজতে গেলে প্রাচীন মন্দিরগুলিকেই নজরে আনতে হবে। সমস্যা হল, ডুয়ার্সে জলপাইগুড়ি আবার বাচ্চা শহর। বৈকুণ্ঠপুরের রাজারা কালী পুজো করতেন। তাঁদের পুজো বেশ পুরানো। শহরের রাজবাড়িতে তাঁরা ধুমধাম করে ভূতচতুর্দশী থেকেই পূর্বপুরুষদের প্রদীপ নিবেদন করে, চোদ্দোরকম শাক খেয়ে কালী পুজোর উৎসব চালু করে দিতেন। রানি পায়েস রান্না করতেন। এ রীতি ডুয়ার্সের প্রায় সর্বত্রই চালু ছিল। বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়িতে জয়কালী মাতার মন্দির আছে। তা স্থাপিত হয় ১৭৭৩-এ।

জলপাইগুড়ি শহরে দিনবাজারের কালী মন্দির অনেক পুরানো। দিনবাজার চত্বর আগে শ্মশান ছিল। শ্মশানের অঙ্গ হিসেবে ছিল রক্ষাকালীর মন্দির। দেবী চৌধুরানির নামে যে কালী মন্দিরটি আছে, সেটা অবশ্য খুব পুরানো নয়। পান্ডাপাড়ার কালী মন্দিরটিকে তুলনায় বেশ প্রাচীন বলে গবেষকদের কেউ কেউ দাবি করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, শ্যামা নামে কালিকার যে শান্ত ঘরোয়া মূর্তি আছে, ডুয়ার্স তল্লাটে তিনি তেমন কলকে পান না। শহরের পুজো কমিটিগুলি যদিও 'শ্যামা পূজা' কথাটা রসিদে লেখে এবং শ্যামার মূর্তিও পুজো করে, কিন্তু ডুয়ার্সে কালী বলতে যদি ভয়ংকর কোনও ব্যাপার না হয়, তবে তার তেমন দাম নেই। এদিকে বৈকুণ্ঠপুর আর ওদিকে কোচবিহার রাজপরিবারের পুজো-অর্চনার প্রভাবে ডুয়ার্সে বৈদিক ধারার পুজো প্রভাব বিস্তার করেছে। রাজারা পুজো করাতেন বৈদিক মতের ব্রাহ্মণ দিয়ে। কিন্তু সে প্রভাব আসার আগে এই মিশ্র এবং রহস্যময় ভূমিতে কালী পুজোর স্বরূপ কেমন ছিল তা কোনও উৎসাহী গবেষক খুঁজে বার করলে জানা যাবে বহু বিচিত্র তথ্য ও ইতিহাস।

দিনবাজার চত্বর আগে শ্মশান ছিল। শ্মশানের অঙ্গ হিসেবে ছিল রক্ষাকালীর মন্দির। পান্ডাপাড়ার কালী মন্দিরটিকে তুলনায় বেশ প্রাচীন বলে গবেষকদের কেউ কেউ দাবি করেছেন। মনে রাখতে হবে যে, শ্যামা নামে কালিকার যে শান্ত ঘরোয়া মূর্তি আছে, ডুয়ার্স তল্লাটে তিনি তেমন কলকে পান না।

বস্তুত, জলপাইগুড়ি শহর সমেত ডুয়ার্সে কালী পুজোর বারোয়ারি হয়ে ওঠাটা নবীন বিষয়। কিন্তু চারদিন ধরে আলো ঝলমল কালী পুজোর এই নবীন ছবিই এখন ডুয়ার্সের জনপদগুলিতে উজ্জ্বল।

**বৈকুণ্ঠ মল্লিক**

---

# আমাদের ছোট্ট পাহাড়

বিজয়াদশমী, লক্ষ্মী পুজো পেরলে কালী পুজোর আয়োজন। আর কালী পুজো মানেই পাহাড় বানানোর ধুম। সে যে কী আনন্দের আর উদ্যমের দিন ছিল। ছেলেবেলার সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল রঙে ভেসে ওঠে। ছুটির এই দিনগুলি কাটত কাদামাটি ছেনে পাহাড় বানিয়ে। আমাদের ছেলেবেলায় কালী পুজো মানেই ছিল পাহাড় বানানো। সে এক খেলা তো বটে, তবে তার আনন্দ খেলার চেয়েও অনেক বেশি।

বাড়ির সামনে এক টুকরো জায়গার সবটা জুড়েই চলত পাহাড় বানানোর ধুম। এত উচ্ছ্বাস, এত মজা যে, শত্রুও তখন একসঙ্গে পাহাড় বানাতে মশগুল। মায়ের পুরানো ছেঁড়া ময়লা কাপড় জোগাড় আর তার জন্য মায়ের হাতে কানমলা খাওয়া। এখন মনে হয় কানমলাটা বড্ডই জোরে ছিল। এখন সেসবই স্মৃতি। মনাই, পিউ, মিষ্টু, তাতাই, সোনাদা, ঋষি, বুয়াদা, পায়েলি— সবার হাতের কবজি অবধি কাদামাটি। কারও হাতে কোদাল, কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে বালতি। গর্ত খুঁড়ে বড়-ছোট লাঠি পোঁতার পর কাপড়ে মাটি-জল মিলিয়ে চাঁদোয়ার মতো লাঠিগুলির উপর বিছিয়ে দিলেই ব্যাস, পাহাড়ের চূড়া তৈরি। বেলা বাড়তেই আবার সব মায়ের হাঁকডাক। ঘড়ির কাঁটা বলছে দেড়টা বাজে— দেখি সব বাড়ির জানালায় বিভিন্ন মায়ের বড় বড় চোখ করা মুখ— কারও মুখে রাগের প্রকাশ, কারও গোল গোল চোখ ঠিকরে বেরচ্ছে, কেউ লাঠি হাতে এগিয়ে আসছে। সব ফেলে সটান দৌড়।

আবার পরের দিনের অপেক্ষা। রাতেও ভাল করে ঘুম আসে না। কতক্ষণে সকাল হবে, ছুটে যেতে হবে পাহাড়ের দেশে। কিন্তু এ কী কাণ্ড! আমাদের হাতে গড়া পাহাড় কই? এ তো ভেঙে যাওয়া পাহাড়ের সব অংশ। কারা করল এমন কাজ? কারা আমাদের এমন শত্রু? করতে পারল এমনটা? সবাই হতাশ, ক্ষুব্ধ। কেউ রাগে গজগজ করছে। কেউ শত্রুকে চিহ্নিত না করেই তাকে নিধন করার প্রতিজ্ঞা করল। ওইরকম একটা বিধ্বস্ত অবস্থায় বেশ কিছুটা সময় গেল। কিন্তু আবার আমরা ভাঙা পর্বতকে গড়লাম। এই করে দুই থেকে তিন দিন গেল, আমরা গড়তেই থাকলাম আর ভাঙতেই থাকল যেন কারা। আর এক খেলা পেয়ে বসল আমাদের। পাহাড় গড়া আর ভাঙা। আমরা অবশ্য জেনে ফেলেছিলাম কারা ভাঙছে। কিন্তু আমরা তাদের পাহাড় ভাঙিনি। তবে কি আমাদের মনে কোনও দুষ্টু বুদ্ধি ছিল না? আসলে আমরা আমাদের পাহাড় তৈরি নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতাম যে অন্যদের ক্ষতি করব— এই চিন্তাই মাথায় আসেনি। মুখ কাঁচুমাচু করেও পাহাড় তৈরির কাজেই মন লাগিয়েছি। ঠিক করলাম যে আমরা পাহারা দেব, যাতে আমাদের পাহাড় কেউ ভাঙতে না পারে। কালী পুজোর ঠিক একদিন আগে আমরা অনেক রাত পর্যন্ত পাহারা দিলাম। সারারাত পারিনি ঠিকই, তবে আমাদের বন্ধু তাতাই বুদ্ধি দিল কিছু একটা করতে হবে, যাতে আর পাহাড় ভাঙতে না পারে। ঠিক হল পাহাড়ের

এক বিশাল গাছ হঠাৎ মন্দিরের উপরে পড়ে গেলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কুচকুচে কালো আঠারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দক্ষিণাকালীর মূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয়নি।

কাপড়ের ভেতর তারকাঁটা দিয়ে রাখা হবে, যাতে ভাঙতে গেলেই হাতে খোঁচা খাবে আর ওদের চিৎকারে সবাই জেগে উঠে হাতেনাতে ধরে ফেলবে। সেবার আর ওরা পাহাড় ভাঙার সাহস পায়নি।

ঠিক কালী পুজোর আগের দিনই পাহাড়ের গুহা, নদী, চড়াই-উতরাই পথ প্রভৃতি কাজ সম্পন্ন করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ত। এবার শুধু সাজানোর পালা। পরের দিন সকাল থেকে পাড়ায় পুজোতে আলো লাগানো। মণ্ডপসজ্জা যখন চূড়ান্ত পর্বে, তখন আমাদের পাহাড়ও নানা সাজে সেজে উঠত। পাহাড়ি রাস্তায় টুনি বাল্‌বের লাইটপোস্ট, জঙ্গলে হাতি, বানর, গন্ডার, বাঘ, সিংহ। নৌকোর মধ্যে তেল দিয়ে আগুন জ্বেলে নদীর মধ্যে ছাড়া। সব কিছু মিলেমিশে তৈরি হত আমাদের পাহাড়। যতদিন মণ্ডপে ঠাকুর রয়েছেন, ততদিন পাহাড়ও থাকবে। সব্বাইকে আমন্ত্রণ জানাতাম আমাদের পাহাড় দেখবার জন্য। বাহবাও দিত সক্কলে। আর সব থেকে ভাল লাগত পাড়ায় যখন লাইন ধরে বাচ্চারা বাবা-মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখতে বার হত, তখন আমাদের পাহাড়ও দেখতে আসত তারা। সেই মুহূর্তগুলো ছিল সব থেকে আনন্দের। পাহাড়ের সামনে কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখতাম। চেয়ার, টুল, মোড়া পেতে আড্ডাও দিতাম অনেক রাত পর্যন্ত। যখন মানুষের ঢল নামত রাস্তায়, আমাদের পাহাড়ের দিকেও অনেকের চোখ পড়ত। তাদের কারও কারও মন্তব্য স্পষ্ট শুনতে পেতাম— ‘ওই দেখ কী সুন্দর পাহাড়।’ ‘ও মা! দেখ দেখ এই পাহাড়টা। খুব সুন্দর তো।’ এরই মধ্যে কিছুটা সময় বার করে আমরাও দল বেঁধে বার হতাম। চেনা বন্ধুরা কে কেমন পাহাড় বানিয়েছে যাচাই করতাম। দেখতে দেখতে তিনটি দিন পার হয়ে যেত। চতুর্থ দিন সকালে খুব মন খারাপ লাগত, এবার নিজেদের পাহাড় নিজেদেরই ভাঙতে হবে। ঠাকুর নিরঞ্জনের পাশাপাশি আমাদের পাহাড় ভেঙে ফেলতে হবে নিজেদের হাতেই। ভারাক্রান্ত মনে সেটাও করতে হত।

**উইনি রায়**

# মেটেলির দক্ষিণাকালী

চালসা গোলাই থেকে বাঁ দিক ঘুরে পিচ ঢালা রাস্তা ধরে রেল লাইন পেরিয়ে সেটা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলতে চলতে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচুতে ওঠা। তারপর সোজা উত্তর মুখে সাত কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার পর, রাস্তার দু’ধারের সাজানো-গোছানো দোকানপাট নিয়ে যে জমজমাট ছোট্ট বাজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেটাই মেটেলি বাজার। সেখানে গত একশো তেতাল্লিশ বছর ধরে পূজিত হয়ে আসছেন মা দক্ষিণাকালী। মেটেলি থানার উলটো দিকে ১২৭৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৮৭২ সাল) এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, যা মেটেলি কালীবাড়ি নামেই পরিচিত। মন্দির পরিচালন কমিটির বর্তমান সভাপতি হরেন্দ্রনাথ দে জানান যে পুরানো মন্দিরটি প্যাগোডার ধাঁচে টিনের চাল ও টিনের বেড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

১৯৭৬ সালে মন্দিরের পাশে থাকা এক বিশাল গাছ হঠাৎ মন্দিরের উপরে পড়ে গেলে মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে মন্দিরের ভেতরে থাকা কুচকুচে কালো (সম্ভবত কষ্টিপাথরের তৈরি) আঠারো ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের দক্ষিণাকালীর মূর্তিটির কোনও ক্ষতি হয়নি। তৎকালীন মন্দির কমিটি সেই ভাঙা মন্দিরের জায়গায় পাকা মন্দিরগৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। যথাসময়ে নির্মাণকাজ শুরু হলে ভিত নির্মাণের জন্য মাটি খুঁড়তে গিয়ে মাটির নীচ থেকে পাওয়া যায় একটি সিমেন্টের ফলক, একটি মাটির প্রদীপ ও শাল গাছের একটি গুঁড়ি। সেই ফলকে খোদাই করা ‘১২৭৮ বঙ্গাব্দ’ লেখাটি থেকে ধারণা করা হয় যে, মন্দিরটি ওই সময়কালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হরেন্দ্রনাথবাবু আরও জানালেন, এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের একটা প্রভাব থাকতে পারে। কারণ ১৮৮৬ সালের মন্দির কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন ধানচাঁদ লামা। তিনি একজন বৌদ্ধ। এ ছাড়া মায়ের মুখের আদলেও মঙ্গোলীয় ছাপ রয়েছে। পাহাড়িদের মতোই হনু উঁচু।

২০০৩ সালে পুনরায় মন্দির আধুনিকীকরণের কাজ শুরু করা হয়, যে কাজ শেষ হয় ২০০৭ সালে। ডুয়ার্সের অন্যতম দ্রষ্টব্য এই কালী মন্দিরে পুজো দিতে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, এই রাজ্যের বাইরে থেকেও প্রচুর মানুষের সমাগম হয়।

**সুধাংশু বিশ্বাস**

# উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা-বাগানের সমস্যা বুঝতে ইতিহাসে ফেরা দরকার

যে চা নিয়ে আমাদের এত ভাবনা, সেই চা কীভাবে আমাদের টেবিলে চায়ের কাপে এমন ঘ্রাণের ও স্বাদের আমেজ তোলে, তার ঘরে একবার উঁকি মারা দরকার। চা-গাছের পাতায় পাতায় আছে ঘাম, কান্না ও আর্তনাদ। এর গোড়ায় আছে অনাহারে মৃত্যুর হাহাকার। তবু চা-গাছের দু'টি পাতা আর একটা কুঁড়ির রসায়ন না জানা থাকলে বোঝা সম্ভব নয় এই শিল্প সাম্রাজ্যের সামগ্রিক ইতিহাস ও তার ইতিবৃত্ত।

চা-বাগিচা শিল্প পরিকাঠামোর দুটো রূপ— সংগঠিত ও অসংগঠিত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি অবশ্য খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। চা-বাগিচা শুরু হয়েছিল সংগঠিতভাবেই। ১৯৫০ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার পরপরই যে হিসেব পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায়, সে সময় সারা দেশে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ৬,৭৩১টি। মোট আয়তন ছিল ৩,১৫,৬৫৬ হেক্টর। চা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,৭৮,২১২ টন। প্রতি হেক্টর জমির গড় উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮৮১ কেজি। রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২০০ মিলিয়ন কেজি। সে দিন প্রতি কেজি চায়ের দাম ছিল ভারতীয় মুদ্রায় ৪.০১ টাকা। চা রপ্তানি করে আয় হয়েছিল ৮০ কোটি ৪২ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, ইংরেজ মালিকানায় যাকে সাধারণভাবে বলা হত সংগঠিত চা-বাগিচাক্ষেত্র, তার বাইরে যে সমস্ত এলাকায় চা-বাগিচা স্থাপনের সম্ভাবনা আছে, সেখানে চা-বাগিচা স্থাপন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় চা-পর্ষদের মাধ্যমে সমীক্ষা চালায়, অরুণাচল, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ইত্যাদি উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে চা-বাগিচা স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হয়। প্রথমে সরকারি উদ্যোগে চা-বাগিচা স্থাপন করা হলেও পরে বেসরকারি উদ্যোগে চা-বাগিচা স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া শুরু হয়েছিল। মণিপুরের 'মণিপুর প্ল্যান্টেশন ক্রপস কর্পোরেশন', 'ইউনাইটেড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট', মেঘালয়ের 'বিয়াতা টি কোঅপারেটিভ সোসাইটি', অরুণাচলপ্রদেশ বন নিগম, সিকিমের 'টেমি চা এস্টেট' ইত্যাদি সরকারি উদ্যোগে স্থাপিত হয়। এখনও পর্যন্ত সেগুলি সাফল্যের সঙ্গেই পরিচালিত হচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ননট্র্যাডিশনাল এলাকায় যে চা-বাগানগুলি গড়ে উঠেছিল, তার আয়তন ছিল ১৮,৮২৯ হেক্টর। ওই পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে যেখানে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৫৬ হেক্টর জমিতে চা চাষ হত, ২০০৮ সালে সেই আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,৭৯,৩৩৭ হেক্টর। ১৯৯০ সালে এ দেশে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ১৩,৮৬১টি। ২০০৮ সালে সেই সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে হল ৫৯,১৯০টি। এর মধ্যে অবশ্য ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যাকেও যোগ করা হয়েছে। উল্লেখ করতে হয়, ভারতীয় চা-পর্ষদের সংজ্ঞা অনুসারে যে সমস্ত চা-বাগানে চা-আবাদি জমির পরিমাণ ১০.১২ হেক্টর বা কম, সেইসব চা-বাগিচাকে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা বলা হয়। এই হিসেবে সারা দেশে টি-বোর্ডের ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচার নথিভুক্ত সংখ্যা ছিল ১,৫৭,৫০৪। এই ক্ষেত্রে চা-আবাদি জমির পরিমাণ ছিল ১,৬২,৪৩১ হেক্টর। পশ্চিমবঙ্গে ওই সময়ে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যা সরকারিভাবে ৯,৯৯০টি বলা হলেও প্রকৃত সংখ্যা এর কয়েকগুণ বেশি। এর কারণ, এই রাজ্যে ভূমি দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই কৃষিজমিতে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র চা-বাগিচা গড়ে উঠেছে তা ভূমি দপ্তর থেকে 'এনওসি' না পাওয়ায় টি-বোর্ডে এদের নাম নথিভুক্ত হয়নি। এর ফলে এইসব ক্ষুদ্র চা-বাগানের মালিকরা একদিকে যেমন ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাচ্ছেন না, তেমনি টি-বোর্ড থেকে প্রাপ্য সুবিধাগুলি থেকেও তাঁরা বঞ্চিত থেকে গিয়েছেন। অথচ তামিলনাড়ু, বিশেষ করে

| প্রদেশের নাম | ১০.১২ হেক্টর ক্ষুদ্র বাগান | ক্ষুদ্র চা-বাগানের মোট জমি (হেক্টর) | বৃহৎ চা-বাগান | জমির পরিমাণ (হেক্টর) | মোট উৎপাদন টন |
|---|---|---|---|---|---|
| ত্রিপুরা | ১৪১০ | ১৬৫৬ | ৬০ | ৭৩০৬ | ৭৮৫৬ |
| অরুণাচলপ্রদেশ | ৩৬ | ২০৯ | ২৭ | ২৩৬১ | ৫৮৪২ |
| মণিপুর | ৪২৭ | ১২০০ | ৬ | ১১৯ | ১১০ |
| নাগাল্যান্ড | ১৪৫১ | ১৮০০ | ৭ | ৯৮ | ১৯১ |
| মেঘালয় | ১০১৩ | ৪১৪ | ৭ | ১৫০ | ২৫৯ |
| মিজোরাম | ২৬৯ | ৩৮৮ | ৭ | ২৬২ | ৭৫ |
| উত্তরাঞ্চল | ৭০ | ৭৪৬ | ১২ | ৮৩৯ | ২৩১ |
| হিমাচলপ্রদেশ | ৩৬৯৫ | ১৬৬০ | ২৪ | ৬৮৮ | ৭৬৯ |
| বিহার | ৯৮০ | ১৯৭৩ | ১ | ২৭ | ১০৯৮ |
| উত্তরপ্রদেশ | — | | ১ | ২১৪ | জানা যায়নি |
| ওড়িশা | — | | — | — | ৮২ |
| সিকিম | ৩ | ১৭ | ১ | ১৭৭ | |
| **মোট** | ৯৩৫৪ | ১০০৬৩ | ১৫৩ | ১২,২৪১ | ১৬,৫১৩ |

নীলগিরি পাহাড় এলাকায় যে সমস্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচা গড়ে উঠেছে, তাদের স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে সেখানে ওই সময়ের মধ্যে সরকারিভাবে নথিভুক্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচার সংখ্যা ছিল ৬৮,১৩৫টি। এরা ব্যাঙ্ক ঋণসহ টি-বোর্ডের ভরতুকি পেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারছে। শুধু তামিলনাড়ুই নয়, অন্য রাজ্যগুলিও কিন্তু স্ব স্ব রাজ্যে ক্ষুদ্র চা-বাগিচাগুলিকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে এসেছে। ফলে পশ্চিমবাংলা ও অসমের সংগঠিত চা উৎপাদন অঞ্চলের সীমা ছাড়িয়ে অন্য রাজ্যগুলিতে ক্ষুদ্র চা-বাগানের সংখ্যা যে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাবার সুযোগ পাচ্ছে তা উপরের তালিকা থেকে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

**উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা মালিকের সমস্যা**

ক্ষুদ্র চা-বাগিচা প্রসঙ্গে আলোচনায় উত্তরবঙ্গ এসে পড়ার যুক্তি হচ্ছে, এই রাজ্যে একমাত্র উত্তরবঙ্গেই চা-বাগিচা আছে। শিল্পহীন রাজ্যের এই উত্তরভাগে চা-ই একমাত্র শিল্প, এই অঞ্চলের জীবনপ্রবাহের ধমনি। আগেই বলা হয়েছে, এই এলাকার চা-বাগিচাগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি সংগঠিত বা ট্র্যাডিশনাল, দ্বিতীয়টি অসংগঠিত বা ননট্র্যাডিশনাল। উত্তরবঙ্গে সংগঠিত চা-বাগিচার সংখ্যা ৩০০টির মতো। এগুলি গড়ে উঠেছে সরকার থেকে লিজপ্রাপ্ত জমির উপর। এর মধ্যে এমন চা-বাগান আছে, যাদের বয়স শুধু যে ১০০ বছরের বেশি তা নয়, এসব বাগানের অনেক চা-গাছের বয়স ১০০ বছর ছুঁইছুঁই। কিন্তু সেগুলির জায়গায় নতুন চা-গাছ লাগানোর জন্য খরচ করতে কিছু বাগানের মালিক আগ্রহ দেখাননি। একটি চা-গাছের পাতা দেবার ক্ষমতা ৫০-৫৫ বছরের বেশি হয় না। এই বৃদ্ধ চা-গাছগুলির আর চা-পাতা উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। তবু ওই বৃদ্ধ পাতা তুলে এনে চা উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে। পড়ছে চায়ের মান। হারাচ্ছে বিদেশের বাজারে ভারতের সুনাম।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় সরকারি অনুমতি বা লিজ ছাড়াই ধানি জমিতেই গড়ে উঠছে অনেক ক্ষুদ্র চা-বাগান। ভাবা হয় না চা-গাছের জন্য কী ধরনের জমি ও জলবায়ুর প্রয়োজন। জানার চেষ্টা হলে তারা দেখতে পারত, পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু প্রথম চা-গাছ লাগানো হয়েছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের মাটিতে। বাঁচেনি। বাঁচতে পারেও না। মেরু অঞ্চল থেকে মেরুভল্লুক এনে যদি সাহারার মরুভূমিতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সেখানকার জলবায়ুতে যে তারা বাঁচবে না তা জানতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। একই কথা বলা চলে চা-গাছসহ সমস্ত উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও। দার্জিলিং থেকে কমলালেবুর চারা কলকাতার মাটিতে লাগিয়ে তাকে হয়ত বাঁচানো যাবে। গাছে কমলালেবুও ফলবে। প্রশ্নটা হচ্ছে, দার্জিলিঙের কমলালেবুর স্বাদ যদি তাতে না পাওয়া যায়, তবে সেই কমলালেবুর চাষ দক্ষিণবঙ্গের মাটিতে কতজন করতে এগিয়ে আসবে? এগিয়ে এলেও তাতে কোনও লোভ হবে না।

দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা-বাগিচার প্রসার দেখে উত্তরবাংলার অন্য ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনের আগে কিছু মানুষ এখানে আনারস চাষের জন্য হইহই করে নেমে পড়েছিল। প্রথমে শুরু হয়েছিল তরাইয়ের দুধিয়া থেকে বিধাননগর-ইসলামপুরে স্থানীয় কৃষকদের কাছ থেকে ধানি জমি বাজারদরের চেয়ে বেশি দর দিয়ে কিনে আনারসবাগান তৈরির কাজে নেমে পড়ার মধ্যে। সেখান থেকে বিস্তার ঘটে চলল জলপাইগুড়ি ও ডুয়ার্সের বুকে ধানি জমিগুলিকে আনারসবাগানে রূপান্তরকরণ।

পরিবেশবিজ্ঞানীরা এভাবে ধানি জমিকে রাতারাতি আনারসবাগানে রূপান্তরিত করার বিষময় ফল নিয়ে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন। ধানি জমিতে আনারসের চাষ ঘটিয়ে তার উৎপাদনের কলেবর বৃদ্ধি করতে যথেচ্ছভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হল। প্রথম ৫-৬ বছর সার প্রয়োগে আনারসের আকৃতি ও লাভের অঙ্ক দেখে মনে করা হয়েছিল, উত্তরবঙ্গের নাম চা-বাগিচা সাম্রাজ্যের পরিবর্তে হতে চলেছে আনারস সাম্রাজ্য। কিন্তু ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত ফল। রাসায়নিক সারের প্রভাবে মাটি হারাল তার উর্বরা শক্তি। জমির চরিত্রে ঘটল ভয়াবহ পরিবর্তন। যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা জমিতে আনারসের ফলন ঘটিয়ে প্রাচুর্যের প্রাসাদ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, তারা দেখল, জোর করে জমির চরিত্র পালটাতে গিয়ে তারা অজান্তেই প্রাসাদের নিচে গভীর ফাটল সৃষ্টি করে ফেলেছে। আনারসের উৎপাদন নেমে এল প্রায় শূন্যে। জমির চরিত্র পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে ধান চাষের চেষ্টাও ব্যর্থ হল। উত্তরবাংলার ধানি জমিতে আনারস শিল্প-বাগিচার অভিযানে এই ব্যর্থতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই এনে দিয়েছিল এক ভয়ংকর বিপর্যয়। যে মধ্যবিত্ত মূলত বাঙালি, তারা এই অভিযানে হল সর্বস্বান্ত। ব্যাঙ্ক থেকে বাড়িঘর বন্ধক রেখে তারা নিয়েছিল ঋণ। বিক্রি হল ঘরবাড়ি। অনাদায়ী ঋণের বোঝায় ব্যাঙ্কের এনপি'র পরিমাণ বৃদ্ধি পেল লাফিয়ে লাফিয়ে। বহু স্থানীয় কৃষক নগদ প্রাপ্তি ও আনারসবাগানে শ্রমিক হিসেবে নিয়মিত কাজের আশায় জমি বিক্রি করে ভূমিহীন দিনমজুরে পরিণত হয়েছিল। তারা যেমন জমি বিক্রি করে নগদ টাকা হাতে পেয়ে ভোগ্যপণ্য কিনে কিছুদিনের মধ্যেই সেই অর্থ শেষ করে ফেলেছিল, তেমনই আনারসবাগান বন্ধ হওয়ায় সেখান থেকেও কর্মচ্যুত হল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল সরকারের বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চোখের সামনেই। নানা জাতিগত জনবিন্যাসের সমস্যায় কণ্টকিত এই অঞ্চলের ওই আনারস সাম্রাজ্য অভিযানের ভবিষ্যতের ফল কী হতে পারে তা ভাবার প্রয়োজন অনুভূত হল না। আজকের শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি শহরে যে রাতারাতি রাজবংশী রিকশাচালকের সংখ্যা এবং এককালের রক্ষণশীল রাজবংশী মেয়েরা যে দিনমজুরের কাজের জন্য ভিড় বাড়িয়ে চলেছে, তার কারণ জমি থেকে উৎখাত হতে বাধ্য হওয়া।

উত্তরবাংলায় আনারস সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে যে ঘটনা ঘটেছিল, আজ বিশাল এলাকা জুড়ে ধানি জমির উচ্ছেদ ঘটিয়ে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনের এক উন্মাদনা শুরু হয়েছে, তাও একই রকম বিপদের চিহ্ন অনাগত ভবিষ্যতে বয়ে আনতে পারে।

# ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

## ধূপগুড়ি পৌরসভা

ডুয়ার্সের অন্যতম শহর ধূপগুড়ির ভৌগলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও দীর্ঘদিনের অনুন্নয়ন ও অবহেলার সাক্ষী ছিল এখানকার পুর এলাকার মানুষ। রাজ্যের ক্ষমতায় দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আসবার পরে ধূপগুড়ি পুরসভার মানুষও সেই পথ অনুসরণ করেন। নতুন পৌরসভা গঠনের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় উন্নয়নের কাজকর্ম। বলাই বাহুল্য, এই কয়েক বছরেই পুরসভার কর্মকাণ্ডের তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কাজকর্মের মধ্যে উল্লেখ্য, কুমলাই ও বামনি নদীর উপর আটটি ব্রিজ, থানা রোডকে ওয়ান ওয়ে করা, রাস্তা চওড়া করা, ১০টি কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, কুমলাই ড্যাম মেরামত, শ্মশানঘাট মেরামত, নতুন পৌরসভা ভবন নির্মাণ, এরকম আরও অনেক। আমাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, মায়ের থান থেকে সুকান্ত কলেজ পর্যন্ত উন্নত রাস্তা, বাস টার্মিনাস ইত্যাদি।

আজকের শুভ্র শরতে দেবীর আগমনে আমরা সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গিন মঙ্গল কামনা করি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকি ধূপগুড়ি শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য।

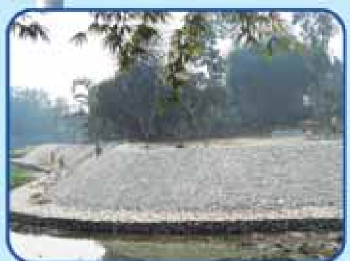

**শৈলেন চন্দ্র রায়**
চেয়ারম্যান, ধূপগুড়ি পৌরসভা

**অরূপ দে**
ভাইস চেয়ারম্যান,
ধূপগুড়ি পৌরসভা

> চা-বাগিচার মালিকরা যে অর্থে টি-প্ল্যান্টার বা বাগিচা শিল্পপতি, সেই অর্থে এই সমস্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচার মালিকদের টি-প্ল্যান্টার ক্লাবের সদস্যপদ দেওয়া যাচ্ছে না। আবার এঁরা নিজেদের চা-চাষি বলেও মেনে নিতে চাইছেন না।

একটা প্রশ্ন এখানে উঠে আসতেই পারে। উত্তরবঙ্গের মাটিতেই কেন এরকমভাবে হঠাৎ হঠাৎ বাগিচা চাষের অভিযান হচ্ছে? এর প্রথম উত্তর হচ্ছে, স্বাধীনতার আগে তো বটেই, স্বাধীনতার পরও রাজ্যের এই উত্তর ভাগের জন্য রাজ্যের অভিভাবকরা কোনও শিল্প প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসেননি। দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত ৯৫ : ৫। অর্থাৎ, প্রতি ১০০ জন পিছু দক্ষিণবঙ্গে যেখানে ৯৫ জন বিভিন্ন শিল্পে কাজ করার সুযোগ পায়, সেখানে উত্তরবঙ্গে সুযোগ পায় মাত্র ৫ জন। অথচ সারা রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশেরও বেশি মানুষ বাস করে এই উত্তরবঙ্গে।

চা-বাগিচা ফ্যাক্টরিনির্ভর বাগিচা শিল্প। তাই একে বাগিচা শিল্পে রূপ দিতে হলে প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ মূলধন। এই এলাকার মধ্যবিত্ত মানুষ তাই কাজের অন্য কোনও সুযোগ না পেয়ে স্বল্প মূলধনে আনারস চাষে তাদের ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করেছিল। এতে হয়ত ভাগ্য কিছুটা ফেরাতে পারত, যদি সরকার এখানে আধুনিক ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার ব্যবস্থা করত। এর সঙ্গেই গড়ে উঠতে পারত প্যাকেজিং শিল্প। দার্জিলিং পাহাড়ে কমলালেবু ছাড়াও পাহাড় ও সমতলে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণ টম্যাটো। এরই পাশাপাশি এখানে উৎপাদন হয় আদা, এলাচ ও আলু। একটা উৎপাদন ব্যাহত হলে অপর একটি ফসলের সাহায্যে গড়ে উঠতে পারত শিল্প। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করল না।

**উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র চা-বাগিচার পেছনে ছোটার কারণ কী?**

আনারস চাষের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে এখানে একটা উপলব্ধির জন্ম হয়েছিল, কাঁচা ফসলের প্রক্রিয়াজাত কারখানা না থাকলে শুধু কাঁচা বাজারের উপর নির্ভর করে খুব বেশি দূর এগনো যায় না। এখানেই হাজির হল ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনের ভাবনা। ডুয়ার্স এবং তরাই জুড়ে চা-বাগান, চা-বাগিচার একটা পরিবেশ আগে থেকেই ছিল। যদিও সমতলের এই কৃষিজমির চরিত্র এবং জলবায়ুর প্রভাব চা-বাগিচার পক্ষে কতখানি উপযুক্ত তা ভাবার যথেষ্ট কারণ ছিল এবং এখনও আছে।

উত্তরবঙ্গের এই ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, বাগিচা শিল্পের ক্ষেত্রেই এক চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটছে। মধ্যবিত্তের পুঁজি যে শুধুমাত্র উত্তরবাংলার মাটিতেই ক্ষুদ্র চা-চাষে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে তা নয়। ভারতের অন্য জায়গাতেও যে ওই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে, তার তালিকা আগেই হাজির করা হয়েছে। প্রথম সমস্যা হচ্ছে, এই ধরনের ক্ষুদ্র চা-বাগিচার উদ্যোগপতিদের কোনওভাবেই চা-শিল্পপতির গঙ্গায় ফেলা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ, এঁরা চা-গাছ রোপণ করছেন বটে, কিন্তু তাঁদের গাছের ফসল কোথায় এবং কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সে ব্যাপারে এঁদের বলার কোনও অধিকার নেই। পাট একটা শিল্প। যারা পাট উৎপাদন করে, তারা তো পাট শিল্পপতি নয়। কারণ, পাটকে কারখানায় কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সেখানে যেমন তাদের বলার কোনও অধিকার নেই, তেমনই বাজারে তাদের উৎপাদিত পাট কত দামে বিক্রি হবে, সেটাও তারা ঠিক করতে পারে না। এরা তাই পাটচাষি মাত্র। একই রকমভাবে আখ দিয়ে বিশাল চিনির কারখানা হয় বটে, কিন্তু যারা আখ উৎপাদন করে, তারা আখচাষি। হতে পারে তারা সম্পন্ন চাষি, তবু তারা আখচাষি।

চা-বাগিচার মালিকরা যে অর্থে টি-প্ল্যান্টার বা বাগিচা শিল্পপতি, সেই অর্থে এই সমস্ত ক্ষুদ্র চা-বাগিচার মালিকদের টি-প্ল্যান্টার ক্লাবের সদস্যপদ দেওয়া যাচ্ছে না। আবার এঁরা নিজেদের চা-চাষি বলেও মেনে নিতে চাইছেন না। এঁদের মানসিকতায় আছে এক জোরালো মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা। চাষ বা চাষি বলতে এঁদের মনের মধ্যে এখনও কাজ করে সেই এক ধরনের হীনম্মন্যতাবোধ। এর প্রধান কারণ, এঁরা দেখেননি কৃষি খামার বা এগ্রিকালচারাল ফার্ম। এঁরা দেখেননি পাঞ্জাবের সেই কৃষকটিকে, যে সকালবেলায় ট্রাক্টর দিয়ে গমের চাষ শুরু করে সারাদিন জমিতে কাজ করে, সে-ই আবার বিকেলবেলায় ট্রাক্টরের সঙ্গে ক্যারিয়ার জুড়ে পরিবারের সব সদস্যকে নিয়ে সেজেগুজে সিনেমা বা অন্য কোনও উৎসবে যোগ দিতে যায়। এঁদের চোখে কৃষক বলতে ভেসে ওঠে হাঁটু ভরতি কাদা মাখা পায়ে, শতচ্ছিন্ন জামা পরিহিত সেই মানুষটি— যার পরিচয় বাংলার চাষি, আরও গভীরভাবে বলতে হলে 'চাষা'।

এই ক্ষুদ্র চা-বাগিচা স্থাপনের যে উন্মাদনা, সে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আপন গতিতেই ইতিহাসে একবারের জন্য চোখ ফেরাতে হয়। কারণ, চা তথা চা-বাগানের ইতিহাস ও তার নয়া রূপ নিয়ে শুরু হয়েছে বিভিন্ন দিক থেকে গবেষণা। এই প্রতিবেদনটি হয়ত তরুণ গবেষকদের কোনও প্রয়োজনে লাগতে পারে।

ভারতীয় চা লন্ডনের চা-নিলামকেন্দ্রে উপস্থিত হতেই সেখানকার মানুষ, বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা এক কথায় বলা যায় অবিশ্বাস্য। ভারতীয় চায়ের এই জনপ্রিয়তা ও চাহিদা দেখে দলে দলে ইংরেজরা সে দিন যেভাবে চা-বাগান স্থাপনের জন্য অসম জুড়ে চষে বেড়াতে শুরু করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা করা চলে দলে দলে ইউরোপীয়দের সোনার সন্ধানে আমেরিকা অভিযানের কথা।

অথচ এই অসমকে ইংরেজ কোম্পানি তাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে কিন্তু তার আগে মোটেই আগ্রহ দেখায়নি। কারণ, ঘন জঙ্গলে ঘেরা ব্রহ্মপুত্রের এই উপত্যকাটি রাজস্ব আদায়ের জন্য ইংরেজ কোম্পানির কাছে মোটেই আকর্ষণীয় ছিল না। তবে ১৮১৭-১৮২৪-এর মধ্যে বার্মার সেনাবাহিনীর বারবার হানা এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চল জুড়ে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তাতে ইংরেজ কোম্পানির পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লক্ষ্য ছিল ভুটান ও তার মাধ্যমে তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন। তাই ভুটানের প্রবেশদ্বার বলে পরিচিত তিস্তার পূর্ব পাড় থেকে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা এলাকাকে তাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে বার্মা সেনাবাহিনীর হামলা এবং নাগাদের লুঠপাটের ঘটনায় কোম্পানি এই ডুয়ার্স নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়েছিল। তাই ১৮২৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যেন বাধ্য হয়েই রাজস্ব আদায়ের প্রশ্নে এই অলাভজনক ভূখণ্ডটিকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। প্রথমে নিম্ন অসমের কামরূপ এবং দারঙ্গ জেলার একটি অংশকে তারা তাদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে। তখন এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল তিন লক্ষ টাকা। ১৮২৮ সালে আপার অসমের জেলাগুলি থেকে মোট আয় ছিল এক লক্ষ টাকা। আপার অসমে চা-বাগিচার সম্ভাবনা এবং প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র ইতিহাসই আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপের দৈত্যের মতো রাতারাতি

পালটে যায়। ১৮৩৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র অসমকেই তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

১৮৩৩ সালের ইংল্যান্ডের সনদে শিল্প পুঁজিবাদকে (Industrial Capitalism) বাণিজ্যিক পুঁজিবাদের (Mercantile Capitalism) উপর জায়গা দেওয়া হয়েছিল। ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্বের উপর এসে পড়ল আঘাত। কারণ, কোম্পানিকে ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি প্রবেশের জন্য সেই সনদের ধারা অনুযায়ী ছাড় দিতেই হল। ফলে ভারতে দীর্ঘমেয়াদি বা স্বাধীন মালিকানা শর্তে ব্রিটিশ মালিকদের এ দেশে জমিগ্রহণের অধিকার দেওয়া হল। ঔপনিবেশিক পুঁজির এই অবাধ ছাড়পত্রের ফলে অসমে দ্রুতগতিতে ঘটল চা-বাগিচা শিল্পে ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগ। ঘটে গেল সমগ্র অঞ্চল জুড়ে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। ১৮৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হল 'অসম টি কোম্পানি'। গভর্নর জেনারেল ইন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ জারি করে বলা হল, 'Waste Lands Grants Rules 1938'-এর আওতায় অসম টি-কোম্পানিকে জমি ব্যবহার ও দখলের পূর্ণ অধিকার যেন দেওয়া হয়। অসমের ভৌগোলিক অবস্থা চা-শিল্পের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল থাকায় ১৮৭০ সালের মধ্যেই এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা রীতিমতো শক্তিশালী দানবের মতো সাম্রাজ্য বিস্তার করে নিয়েছিল।

উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস যেমন চা-বাগান স্থাপনের ইতিহাসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে, তেমনই বলা যায় সেই ইতিহাসের প্রসারণ ঘটেছিল উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স এবং তরাইয়ের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। তাই এই অঞ্চলের যে কোনও আলোচনায় চা-বাগিচার প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে উপস্থিত হয়।

এই চা-বাগান স্থাপনের জন্যই সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলসহ ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকা জুড়ে শুরু হয়ে যায় ঘন জঙ্গল পরিষ্কার অভিযান। এই অভিযানের একটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৮৪১ সালে এখানে চা-বাগিচাগুলির আয়তন ছিল ২৩১১ একর। ১৮৫৯ সালে এর আয়তন বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৮০০০ একর। ১৮৭১ সালের মধ্যে ৩ লক্ষ একর পতিত জমি চা-চাষের জন্য বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

সে দিনের ভারতে চা-বাগিচা নিয়ে মাতামাতির বর্ণনা পাওয়া যায় ড. সরিৎ ভৌমিকের 'Class Formation with Plantation System' বইটিতে।

লন্ডনের বাণিজ্যজগতে তখন একটাই আলোচনা— ভারতের মাটিতে চা-বাগান। চা-বাগান নিয়ে শেয়ার বাজারে উপস্থিত হল নানা ভুঁইফোঁড় প্রতিষ্ঠান। লন্ডনের মানুষের কাছে তখন চা-গাছ মাত্রই যেন টাকা ফলনদায়ী গাছ। চা-গাছে তখন তাদের কল্পনায় সোনার পাতা ফলে। সেই উন্মাদনার জোয়ারে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। এমনকি অস্তিত্বহীন কাল্পনিক চা-বাগানের নামেও শেয়ার বিক্রি চলেছিল। সাধারণ মানুষ সেই নামে আদৌ কোনও চা-বাগানের অস্তিত্ব আছে কি না, সেই খোঁজটুকু নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করত না। ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল অনেকটা এরকম— শেয়ারের জন্য ডিভিডেন্ড কী এল তা দেখার দরকার নেই। ভারতের চা-বাগানের একটা শেয়ারের মালিকানা আছে, সেটাই যেন পরিচয় ছিল সামাজিক কৌলীন্যের। ফলে আজকের হর্ষদ মেহতাদের মতো বহু মেহতাই লন্ডনের শেয়ার বাজারে ছেয়ে গিয়েছিল।

সাবান জলের ফেনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ১৮৬৬ সালে চা-বাগানের সেই রঙিন বুদ্বুদ ফেটে গেল। এর পরের বছরেই লন্ডনের আর্থিক বাজারে দেখা দিল ভয়াবহ সংকট। এর প্রতিক্রিয়া এসে পড়ল চা-শিল্পের উপর। এতে কিন্তু চা-শিল্পের মৃত্যুর পরিবর্তে নবজন্ম হয়েছিল। পুরানো বহু চা-কোম্পানি, যেগুলি সঠিক পরিচালনার অভাবে ধুঁকছিল, সেগুলির অপমৃত্যু ঘটল। এর ফলে কলকাতা ও লন্ডনের প্রতিষ্ঠিত চা-কোম্পানিগুলি টিকে থাকার ফলে এই শিল্পের রুগ্‌ণ ও ফাটকাবাজ প্রতিষ্ঠানগুলি ধীরে ধীরে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে তাদের ঝাঁপি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। এতে লাভ হল চা-শিল্পেরই। চা-বাগিচা ফাটকাবাজদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হল বাগিচা শিল্পে।

### ক্ষুদ্র চা-বাগানে মালিকরা চা-চাষি না প্ল্যান্টারস?

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-বাগান যে শুধু উত্তরবঙ্গেই গড়ে উঠেছে তা নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারত তো বটেই, পৃথিবীর বহু দেশেই এখন গড়ে উঠছে এ ধরনের ক্ষুদ্র চা-বাগান। বলা যেতে পারে, এটিও বিশ্বায়নের এক প্রভাব। প্রথমে এই ক্ষুদ্র বাগানগুলি গড়ে উঠেছিল ইতস্তত়ভাবে যেখানে সস্তায় জমি পেয়েছে, সেখানে। অস্তিত্ব রক্ষার চাষ, যাকে বলা যেতে পারে Subsistence Agriculture তা এই ক্ষুদ্র চা-বাগানের অভিযানের পর রূপান্তরিত হয়েছে ব্যবসাদারি কৃষিতে, যাকে বলা হয় Commercial Agriculture।

চায়ের বাজার বিশ্ব জুড়ে। অর্থাৎ রপ্তানিযোগ্য কৃষি। তাই একটা ভাবনা এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে বলে মনে হয়। বিশ্বায়নের যুগে রপ্তানি সামগ্রী মুনাফা অর্জনের পক্ষে সহায়ক। চিনের রপ্তানি বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতির সাফল্যে অনুপ্রাণিত হওয়াটাও হয়ত এই ক্ষুদ্র চা-বাগান প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-বাগান যে শুধু উত্তরবঙ্গেই গড়ে উঠেছে তা নয়, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ভারত তো বটেই, পৃথিবীর বহু দেশেই এখন গড়ে উঠছে এ ধরনের ক্ষুদ্র চা-বাগান। বলা যেতে পারে, এটিও বিশ্বায়নের এক প্রভাব।

পরোক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে। এই রাজ্যে রাজ্য সরকার, তা বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূলের রাজত্ব, এ ধরনের ক্ষুদ্র চা-বাগানের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতসহ অন্য রাজ্যগুলি সাহায্যের হাত যেভাবে প্রসারিত করে তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সুযোগ করে দিচ্ছে, তার কোনও উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে এ রাজ্যে নেই।

১৯৮০-র দশক নাগাদ চায়ের দাম দেশের বাজার তো বটেই, বিদেশের বাজারেও ভাল ছিল। এ দেশের প্রতিষ্ঠিত চা-বাগানগুলি তাদের চা-বাগানের চা-পাতা দিয়ে সেই চাহিদা মেটাতে পারছিল না। অথচ তাদের চা-বাগানের আয়তন বাড়িয়ে নতুন গাছ লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর পরিবর্তে বাইরে থেকে চা-পাতা কিনে তাদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করাটাই ছিল বেশি লাভজনক। কারণ, আয়তন বৃদ্ধির অর্থ অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ। শ্রমিক নিয়োগের অর্থ শুধু মজুরি নয়, প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কারদের নিয়মানুসারে বোনাস, গ্র্যাচুইটিসহ অন্যান্য সুযোগ দিতে হয়। ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যেমন বহু জিনিস নিজেরা উৎপন্ন না করে বাইরে থেকে অর্থাৎ outsourcing-এর মাধ্যমে কম দামে তা আমদানি করে বাজারে নিজেদের ব্র্যান্ড নামের ছাপ দিয়ে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে, বাগিচা শিল্পেও ঘটে গিয়েছে তার অনুপ্রবেশ। তার উপর নির্ভর করেই চা-শিল্পে ঘটল এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চা-বাগানের অভিযান। এখানকার চা-পাতা বড় চা-বাগানগুলি ক্রয় করে নিয়ে গিয়ে তাদের বাগানের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদন বৃদ্ধির কাজ শুরু হল। এই চা-পাতা যেহেতু ক্রয় করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাই এর নাম Bought Leaf Factory। সংক্ষেপে BLF। এই নিয়েই শুরু হবে এই নতুন চা-অভিযানের কাহিনি।

**সৌমেন নাগ**

# বদলে যাচ্ছে মালবাজার !

একটা সময় ছিল যখন আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বাইরে থেকে মালবাজারে এলে অস্বস্তিতে পড়তে হত এই শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের। কারণ, মালবাজারের সরু ভাঙাচোরা রাস্তা, অসংখ্য শীর্ণ কাঁচা নিকাশি নালা। প্রথমে পৌরসভা তারপর মহকুমা শহর, মাথায় দু-দুখানি পালক গুঁজেও মালবাজার ঠিক শহর হয়ে উঠতে পারছিল না। রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি নালা নাগরিক স্বাচ্ছন্দের প্রাথমিক চাহিদাগুলো পূরণ না হওয়ায় পিছিয়ে পড়ছিল মালবাজার। এরই মধ্য দিয়ে মাল পৌরসভার বিগত বোর্ডগুলো নিজেদের সাধ্য মতো চেষ্টা করেছে মালবাজারকে বদলে দেবার। কিন্তু সেই উন্নয়নের গতি ছিল অনেকটাই শ্লথ। অবস্থাটা বদলে গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শপথ নেওয়ার পর। মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রিয় শহর মালবাজারকে সাজিয়ে তুলতে হাত বাড়াল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর থেকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। শুরু হল মালবাজারকে বদলে দেবার পালা। আর এই উন্নয়ন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত হলেন মাল পৌরসভার পৌরপতি, উৎসাহী যুবক স্বপন সাহা। তার নেতৃত্বে এবং দলমত নির্বিশেষে সমস্ত পৌরপিতা (কাউন্সিলর)'দের দ্বিধাহীন সমর্থনে সমস্ত মালবাজার শহর জুড়ে আরম্ভ হয়েছে কর্মযজ্ঞ। আর এই কর্মযজ্ঞে সবচাইতে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়নে। তাই এই শহরের প্রায় সমস্ত রাস্তা এবং নিকাশি নালা সংস্কার করা হচ্ছে অনেকটা যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। একদিকে যেমন সরু রাস্তাগুলো দুই পাশ সম্প্রসারণে প্রায় দ্বিগুণ চওড়া হচ্ছে। অন্যদিকে নতুন ভাবে পিচের আস্তরণ দেওয়ায় সমস্ত কাঁচা রাস্তাই পাকা হয়েছে। পাশাপাশি কাঁচা ও সংকীর্ণ নালাগুলি পাকা এবং নিকাশীর প্রয়োজনে প্রশস্ত করা হচ্ছে। একসময় যেখানে নিকাশী নালাই ছিল না, সেখানে নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে নতুন করে পাকা নালা নির্মাণ করা হচ্ছে। তার ফলে দ্রুত বদলে যাচ্ছে মালবাজার।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মালবাজার স্টেশন রোডের কথা। মালবাজার থানা মোড়ে অবস্থিত নেতাজি মূর্তির পেছন থেকে ঘড়ি মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত এই রাস্তা সংস্কারের ফলে এখন অনেকটাই প্রশস্ত। আবার ঘড়ি মোড় থেকে রেলের মাঠ হয়ে যে রাস্তাটি পম্পা সিনেমা হল পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেই রাস্তাটির সংস্কারের কাজও দ্রুত লয়ে চলছে। বলা যায় শতকরা আশিভাগ কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাই আমূল সংস্কারের ফলে বদলে গিয়েছে বা যাচ্ছে। এমনকি শহরের ভেতরের গলিগুলোও অনেকটা চওড়া হয়ে এমন আকার নিয়েছে যে পুরনো পথের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এরই সঙ্গে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নে জাতীয় সড়কের ধারে যেমন হাইড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে তেমন ঘিঞ্জি বাজার রোডেও নিকাশি নালা নির্মাণের কাজ চলছে পুরোদমে।

পরিকাঠামোগত উন্নয়নকে পাখির

উন্নত নাগরিক পরিষেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

## মালবাজার পৌরসভা

স্বপন সাহা, চেয়ারম্যান, মালবাজার পৌরসভা

চোখ করে ইতিমধ্যেই পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়া মালবাজারকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মাল পৌরসভা।

**(এরপর আগামী সংখ্যায়)**

# ডুয়ার্সের পর্যটন উদ্যোগ প্রশংসনীয় কিন্তু আদৌ কি জনমুখী হতে পেরেছে?

আমরা সবাই জানি, পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বলতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আঙিনায় যেটুকু ছবি ভাসে, সেটা হল এই উত্তরবঙ্গের পাহাড়-জঙ্গলই। তবে উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা মন্ত্রক এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের জন্য বিশেষ ভাবনা পর্যটন মন্ত্রীর দায়িত্ব বা গুরুত্ব লঘু করে দিয়েছে কি না, সে প্রশ্নের উত্তর নিন্দুকরাই দিতে পারবেন। পর্যটন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত উপস্থিতি ছাড়াও পর্যটন প্রসারের কাজ চলতে পারে কি না, তাও অনেক ভাল বলতে পারবেন পর্যটন কারবারিরা। কিন্তু এই শিল্পের সঙ্গে যৎসামান্য যোগাযোগের উপর ভিত্তি করে এটুকু বলা সম্ভব, উত্তরবঙ্গের পর্যটন উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ ও সিদ্ধান্ত আজ পর্যন্ত যেটুকু হয়েছে তা কখনওই জনমুখী হয়ে উঠতে পারেনি। পর্যটন দপ্তরের নানাবিধ উদ্যোগের ছবি আমরা কাগজে নিয়মিত দেখতে পাই, কিন্তু তার প্রাবল্য বা বিস্তার এতটাই ক্ষীণ যে সাধারণ মানুষের পর্যটন পরিষেবায় তা কাজে এসেছে যৎসামান্যই। কলকাতা শহরের রাস্তায়, বাসে বা শহরতলির লোকাল ট্রেনে রোজ ভিড়ে পিষ্ট হয়ে যাতায়াত করে যে মানুষ, তারাই ছুটি পেলে ভিড় জমায় পাহাড়ে, ঝরনা বা চা-বাগানের ধারে বা অভয়ারণ্যের ফটকে। তাদের বাঁধনছাড়া বেড়ানোর পাগলামি আর সীমাবদ্ধ পকেটের কথা আজ অবধি ভেবে উঠতে পারল না কোনও জনদরদি সরকার। পর্যটন আজ সচ্ছল মধ্যবিত্তের লাইফস্টাইলের অঙ্গ হয়ে উঠলেও এই বাংলায় বহু মানুষ আছে, যারা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা খাটুনির পর সংসারের সব চাহিদা মেটাতে না পারলেও বছরে অন্তত একটিবার সপরিবারে বেরিয়ে পড়ার জন্য তিলতিল করে পয়সা জমায়। জনসংখ্যার নিরিখে এদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। পর্যটন দরিদ্রদের জন্য না হলেও তার অস্তিত্ব মূলত বেঁচে থাকে এইসব মানুষের জন্যই। অতএব এদের কথা না ভাবলে চলবে কী করে?

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে ফিরে যাই। নয়ের দশকের গোড়ায় রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশে পর্যটন শিল্প যখন গুণমান ও পরিষেবায় আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে গেছে, তখন আমরা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দপ্তরের টুরিস্ট লজ বলতে জানতাম নড়বড়ে খাট, ইঁদুরের দাপাদাপি, কাচ ভাঙা জানালা, প্রাগৈতিহাসিক ঠান্ডা মেশিন ইত্যাদি ইত্যাদি। এর পর সে অবস্থায় অবশ্য পরিবর্তন এল। লজগুলির সংস্কার ও পরিবর্তন হতে শুরু করল, বাড়তে শুরু করল জনপ্রিয়তা, কিন্তু তার সঙ্গে বাড়তে শুরু করল দামও। এবং একদিন তা অধিকাংশ বাজেটবদ্ধ বাঙালির সাধ্যের বাইরে চলে গেল। আজকের জলদাপাড়া বা মূর্তি টুরিস্ট লজে সপরিবারে দুটো রাত থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করতে পারেন পর্যটকের কত শতাংশ? দার্জিলিং যাওয়ার পথে কার্শিয়াং

**পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র না হয় আলাদাই রইল, পর্যটনকে সাধারণের কাছে পৌঁছাবার এক অতি সহজ মাধ্যম হল তীর্থস্থান। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না আগের বামপন্থী শাসক, কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর দেবদ্বিজে যথেষ্ট ভক্তি আছে।**

টুরিস্ট লজের রেস্তরাঁয় আট-দশজনের দল মধ্যাহ্নভোজ বা প্রাতরাশের জন্য ঢুকে ভাগাভাগি করে খেলেও মাথাপিছু খরচ ১০০ টাকার নীচে কি কোনওভাবে করা যায়? অথচ পাহাড়-ডুয়ার্স বেড়াতে আসা ৭৫ শতাংশ টুরিস্টের রোজকার থাকা-খাওয়া-ঘোরা সব মিলিয়ে মাথাপিছু বাজেট থাকে বড়জোর ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা। অতএব সরকারি পর্যটন মানেই ব্যয়সাপেক্ষ— এ ধারণা জনমানসে ক্রমশই বদ্ধমূল হচ্ছে। বন উন্নয়ন নিগমের লজগুলি কিছুটা কম খরচের হলেও তাদের সংখ্যাও নিয়ম মেনেই কম ও নিয়ন্ত্রিত।

শুধুমাত্র সাধারণ পর্যটকের কথাই বা কেন, পর্যটন থেকে যাদের কর্মসংস্থান হয়, সেই স্থানীয় সাধারণ মানুষের কথাও তো আসে, আসতে বাধ্য। আমরা আজ কমবেশি সবাই জানি, আজকের পর্যটনের নতুন নামই হল 'ইকো-টুরিজম', যার মধ্যে পর্যটক, পরিবেশ এবং স্থানীয় জনজাতি সবাই পড়ে এবং সবারই স্বার্থ রক্ষা হয়। একবার কোনও এক বিশিষ্ট নেতার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম, ইকো-টুরিজম মানে 'ইকোলজিক্যাল' বা 'ইকো-ফ্রেন্ডলি' তো বুঝলাম, আদৌ তা 'ইকনমিক্যাল' হয় কি? আশ্চর্য, এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর সদর্থক উত্তর। ডুয়ার্সের বন্য প্রাণ বিভাগগুলির উদ্যোগে ইকো-টুরিজম ভাবনাকে বাস্তবায়িত হতে দেখা গেছে, কিন্তু সেখানেও কেবল অরণ্য সংলগ্ন জনজাতির উন্নয়নের কথাই ভাবা হয়েছে, সাধারণ পর্যটকের কথা নয়। সিঞ্চল অভয়ারণ্যের চটকপুর ইকো-ক্যাম্প বা গরুমারা জাতীয় উদ্যানের রামসাই রাইনো-ক্যাম্প এক কথায় লা-জবাব, কিন্তু বিশাল সংখ্যক পর্যটনপ্রেমীর সাধ্যের বাইরে। জঙ্গল সাফারির খরচ ইতিমধ্যেই নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। এর পেছনে বন দপ্তরের বক্তব্যও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটককে জঙ্গল সাফারির বা বন্য প্রাণ দেখার বিকল্প সুযোগ করে দেওয়া তো সরকারি উদ্যোগ ছাড়া সম্ভব নয়।

খুব স্বভাবতই এখানে উঠে আসে 'কমিউনিটি টুরিজম'-এর কথা। নীতিগতভাবে এই সমুদায়ভিত্তিক গ্রামীণ পর্যটনে লাভবান হতে পারে সাধারণ পর্যটক এবং স্থানীয় সাধারণ দরিদ্র মানুষ দুই-ই। কিন্তু এযাবৎ 'কমিউনিটি টুরিজম'-এর নামে যা দেখা গেছে, যদিও অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, কিন্তু তা এক প্রকারের শোষণই বলা চলে, 'ওয়েলফেয়ার'-এর উর্দি পরা কিছু শহুরে কারবারির অতিধূর্ত প্রচেষ্টা। বছরের পর বছর কেটে গেছে, উত্তরবঙ্গের কোনও গ্রামে কমিউনিটি পর্যটনের মাধ্যমে কোনও আর্থিক সামাজিক বিকাশ চোখে পড়বার মতো কিছু আজও ঘটেনি। কারণ এতে সরকারি হস্তক্ষেপ বা নীতি নির্ধারণের বিন্দুমাত্র প্রয়াস বা সদিচ্ছা আজও হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রশ্নটা খুব সহজ। দেশের একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে কেবল হিমালয়-সাগর-ম্যানগ্রোভের সহাবস্থানই নয়, একমাত্র রাজ্য, যেটি নিজস্ব পর্যটকেই স্বনির্ভর হতে পারে, সেখানে পর্যটনকে জনমুখী করার বাধাটা কোথায়? পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র না হয় আলাদাই রইল, পর্যটনকে সাধারণের কাছে পৌঁছাবার এক অতি সহজ মাধ্যম হল তীর্থস্থান। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না আগের বামপন্থী শাসক, কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর দেবদ্বিজে যথেষ্ট ভক্তি আছে। তাঁকেই বলি, গত চৌত্রিশ বছরের কট্টর লাল পরিবেশে কাটালেও দেওঘর বা কেদারনাথে সবচেয়ে বেশি ভিড় করে এই বাংলার মানুষই। উত্তরবঙ্গের অতি প্রাচীন জল্পেশ বা বাণেশ্বরের শিবরাত্রি উৎসব বা শ্রাবণী পূর্ণিমা মেলা বা কোচবিহার মদনমোহন বাড়ির রাসমেলার ঐতিহ্য, খ্যাতি ও জনসমাগম অভাবনীয়। কিন্তু আজও সেসব জায়গায় পর্যটন দপ্তরের কোনওরকম ভূমিকা দেখা যায়নি। তবে এই প্রথম দুর্গা পুজোকে পর্যটনের আঙ্গিকে তুলে ধরার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে অভাবনীয়।

তেমনি পর্যটনে জনস্রোত বাড়াবার সূতিকাগৃহ হতে পারে রাজ্যের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজগুলি। সরকারি নির্দেশেই পাঠক্রমে আবশ্যিক করা যেতে সামার ক্যাম্প, প্রকৃতি পর্যটন। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রকৃতিসচেতনতা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গে যে ডুয়ার্স জুড়ে পর্যটন বাড়তে পারে বহু গুণে— এ ব্যাপারে কি কারও কোনও সন্দেহ আছে?

ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষবাস সম্ভব হয় না হাতির উপদ্রবের জন্য। সেখানে বিকল্প আয় হিসাবে পঞ্চায়েত স্তরে বাঁশ-খড়-টিনের কটেজ বানিয়ে স্থানীয় বেকারদের সমবায় গড়ে খেতের শাকসবিজ, পুকুরের মাছ, হাঁসের ডিম, বাগানের মুরগি দিয়ে পর্যটকদের স্বল্প বাজেটে খুশি করা কি খুব কঠিন কাজ?

পরিবর্তনের সরকার আসার পর পাহাড়ে অশান্তির ভ্রূকুটি মিলিয়ে গিয়েছে, শান্তির বাতাস বইছে উত্তরবঙ্গ জুড়ে, বহুদিন পরে এসেছে পর্যটন বিকাশের এক আদর্শ পরিস্থিতি। জনদরদি পর্যটনের সুর শোনা গেছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার নতুন সিদ্ধান্তে। রোজ সকালে কলকাতা থেকে পৌঁছানো ট্রেনগুলির সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকেই একের পর এক ছাড়ছে দার্জিলিং, কালিম্পং, গ্যাংটকের বাস। সন্ধ্যায় সেগুলি ফিরছে পাহাড় থেকে নেমে আসা পর্যটকদের ট্রেন ধরাতে। তেমনই ডুয়ার্সের গেটওয়ে মালবাজারে তৈরি হোক একটি টুরিস্ট ট্রান্সপোর্ট হাব, যেখানে চালু হবে ডুয়ার্স ও পাহাড়ে নানা প্রান্তে যাওয়ার সব বাস। স্বভাবতই সাধারণ মানুষের ডুয়ার্স ও পাহাড়ে ঘোরার খরচ অনেকটাই কমবে। বাস যত নিয়মিত ও বেশি হবে, ততই বাড়বে নির্ভরতা ও সাশ্রয়।

কিন্তু তারপর আর কোথায়? পৃথিবীর পর্যটন মানচিত্রে এ রাজ্যের উপস্থিতি আজও ম্রিয়মাণ। তার উন্নয়ন ঘটানো যথেষ্ট সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ কাজ। তার আগে প্রয়োজন জনমুখী কিছু বুনিয়াদি কাজকর্মের। যেমন বক্সা ফোর্টে তাঁবু লাগালেই পর্যটন বাড়বে না, সেখানে পৌঁছানোর জন্য চাই পায়ে হাঁটা ঝুলন্ত সেতু, সদর পর্যন্ত ভাঙা রাস্তার মেরামত আর ফোর্ট চত্বরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। ষাট-সত্তর বছরের মানুষ যেখানে একবার হলেও যেতে পারবেন স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতি রোমন্থন করতে আর নতুন প্রজন্ম পারবে তার শেকড় খুঁজতে। আর সেসব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিতে হবে স্থানীয় মানুষকে, বুক দিয়ে আগলাবে তারা তাদের সম্পদ। তাঁবু খাটালে সেখানে পর্যটক ঢুকবে না, ঢুকবে সাপ-বিছে আর নেড়ি কুকুর। মাঝখানে লাভ হবে কেবল তাঁবু কন্ট্রাক্টর আর কনসালট্যান্টদের। যারা গত জমানায় এভাবেই প্রচুর কামিয়েছে, রং পালটে এখন ঘোরাঘুরি করছে মন্ত্রীদের আশপাশে, সাবধান হতে হবে সেইসব স্বার্থান্বেষীর থেকে।

ডুয়ার্স জুড়ে পর্যটন দপ্তর যে কাজ একেবারেই করছে না, সে কথা বলার মুখ অতি বড় সমালোচকেরও নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতে পর্যটন দপ্তরের আয় বাড়লেও স্বল্প ব্যয়ক্ষমতাসম্পন্ন সাধারণ পর্যটকের কোনও সুবিধা হচ্ছে কি? বাইরের পর্যটকের উপরে আমরা ভীষণ জোর দিই, কিন্তু যে রাজ্যের নিজস্ব পর্যটকের সংখ্যা পৃথিবীর যে কোনও দেশকে হারিয়ে দিতে পারে, তাদের কি অন্যের উপর ভরসা করার আদৌ প্রয়োজন আছে?

**উত্তরায়ণ সমাজদার**

# জয়ন্তি টুরিস্ট লজ উদ্বোধন হলেও চালু হয়নি— আটকে টাইগার রিজার্ভের আইনে?

মুখ্যমন্ত্রী ঘটা করে ঘোষণা করলেও সম্ভবত আইনের গেরোয় আটকে গেছে জয়ন্তি টুরিস্ট লজ। নবনির্মিত বারোটি ঘর বন দপ্তর তুলে দিয়েছিল পর্যটন দপ্তরকে। গরুমারা, জলদাপাড়া, বক্সা— ডুয়ার্সের তিন প্রান্তে পর্যটন দপ্তরের দীর্ঘকাম্য উপস্থিতি পূর্ণ হল। বেশ উত্তেজনার মধ্যেই সাগ্রহে পুজোর ছুটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন পর্যটকরা। কিন্তু আশায় থাকলে তো আর হবে না। পর্যটক পরিষেবার জন্য চাই রান্নাঘর, রেস্তরাঁ, ভাঁড়ারঘর ইত্যাদি ইত্যাদি। সেসব কিছুই রেডি নেই। অতএব পর্যটকদের আপাতত নিরাশ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

টাইগার রিজার্ভের কোর এরিয়ার মধ্যে পড়ায় জয়ন্তিকে সরকারিভাবে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে আইনি বাধা তো আগাগোড়া ছিলই। সে কারণে কিছুদিন স্থানীয় মানুষের চাপে এবং প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকের প্রবল উৎসাহে ঘরোয়া পর্যটনকে কিছুদিন খানিক আমল দিলেও আদতে জয়ন্তির ব্যাপারে বন দপ্তরের গড়িমসি ছিলই বরাবরই। উপরন্তু বলা যায়, টাইগার রিজার্ভ এলাকার থেকে যেসব জনবসতি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, জয়ন্তির নামও সেই তালিকায় রয়েছে। সম্প্রতি বক্সার জঙ্গলে বাঘের অস্তিত্ব নিয়ে জাতীয় স্তরে প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় টনক নড়েছে বনদপ্তরের শীর্ষকর্তাদের তথা রাজ্য সরকারের। কারণ একটাই টাইগার রিজার্ভের খেতাব হারালে কেবল যে সম্মানহানি ঘটে তাই নয়, সেই সঙ্গে বিপুল অর্থপ্রাপ্তিতেও ছেদ পড়ে। যা সরকার বা বনকর্তাদের কারওই কাম্য নয়। এই রকম স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে জয়ন্তিতে দুম করে সরকারি টুরিস্ট লজ খুলে ফেললে তাতে যে উপর মহলের ভ্রুকুঞ্চন ঘটবে তা বলাই বাহুল্য।

অন্যদিকে, এর আগে জয়ন্তি নিয়ে পর্যটনের আকর্ষণ বাড়লেও, সেখানে সঠিক মানের পরিষেবার ঘাটতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। জয়ন্তিতে সরকারি পর্যটন লজের উদ্বোধন স্বভাবতই স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট উজ্জীবিত করে তুলেছিল। কিন্তু তা বাস্তবে পর্যবসিত হতে দেরি হওয়ায় স্বভাবতই অধৈর্য হয়ে উঠছেন তাঁরা। **নি.প্র.**

# ফের প্রচারের আলোয় আসুক ভুটানঘাট

আজকের ইকো পর্যটকদের অনেকেই হয়তো জানেন না এই স্পটটির কথা। প্রচারের আলো থেকে বেশ কিছুদিন আড়ালে থাকা এরকমই একটি স্বর্গভূমি হল ভুটানঘাট। পশ্চিমবঙ্গের নতুন জেলা আলিপুরদুয়ারের অন্তর্গত ভুটানঘাট প্রকৃতিপ্রেমী ও ভ্রমণকারীদের কাছে একটা বড় পাওনা। বছর কুড়ি আগে উগ্রবাদীদের দাপটে পর্যটন মানচিত্র থেকে মুছে গিয়েছিল এই ভুটানঘাট। আজও পুড়ে যাওয়া বাংলোটির ধ্বংসাবশেষের সামনে দাঁড়ালে স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসেন ডুয়ার্সপ্রেমীরা।

আলিপুরদুয়ার থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে ভুটানঘাট যেমন তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য, তেমনই এর ভৌগোলিক অবস্থান এই এলাকার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। পশ্চিমবঙ্গ, প্রতিবেশী রাজ্য অসম ও প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভুটান— এই তিন সীমানার মধ্যস্থলে রয়েছে ভুটানঘাট। ভৌগোলিক অবস্থানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত হলেও এলাকাটি ভুটানের সীমানা ছুঁয়েছে। ভুটান থেকে এলাকাটিকে আলাদা করে রেখেছে অথবা বলা ভাল, ভারত ও ভুটানের সীমানা নির্ধারণ করেছে এই এলাকার উপর দিয়ে বয়ে চলা রায়ডাক নদী। খরস্রোতা রায়ডাক নদীকে বছরের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। এই নদীর ধারে বসে প্রকৃতিপ্রেমিকরা অনায়াসে কয়েকটা ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারেন।

নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যেতে পারেন ‘জিরো পয়েন্ট’ নামক ভারতের শেষ নির্ধারিত এলাকায়। তার ওপারে যাওয়ার অনুমতি পর্যটকদের দেওয়া হয় না।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত এই ভুটানঘাট যেতে হলে সাধারণত জঙ্গলের প্রবেশদ্বার ময়নাবাড়ি বিট থেকে অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। তবে এলাকাটি আন্তর্জাতিক সীমানা ছোঁয়ায় কোনও কোনও সময় ভ্রমণকারীদের বন দপ্তর এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দেওয়া অনুমতির সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট নিয়মাবলি মেনে এ রাস্তায় চলাচল করতে হয়। ময়নাগুড়ি বিট থেকে যাত্রা শুরু করে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ভুটানঘাটের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আপনার পথ আটকে দাঁড়াতেই পারে বন্য হাতির দল। অথবা চলতে চলতে পাথের দু’ধারে দেখা পেয়ে যেতে পারেন ময়ূর, হরিণ কিংবা বন্য শুয়োরের।

বিশেষত, এলাকাটি বাংলা এবং অসমের মধ্যে হাতিদের যাতায়াতের পথ হিসেবে পরিচিত। ভুটানঘাটের নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে এসে এইসব বন্যপ্রাণের দেখা পেলে সেটা পর্যটকদের কাছে একটি উপরি পাওনা। তবে এলাকার গ্রাম্য মানুষদের কিছুটা অভিমানের সুরে বলতে শোনা যায়, পর্যটন দপ্তরের উদাসীনতায় ভুটানঘাটের পিছিয়ে পড়া পর্যটনের কাহিনি। বর্তমানে এলাকার বাসিন্দারা সকলেই জীবিকার জন্য চাষবাস বা চা-বাগানগুলিতে কাজের উপর নির্ভরশীল। পর্যটন দপ্তর ভুটানঘাটকে প্রচারের আলোয় আনলে এবং হোম স্টে, প্যাকেজ টুর ইত্যাদি স্বনির্ভর প্রকল্পগুলির অনুমতি দিলে এলাকার গরিব সাধারণ মানুষরা যে আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হবেন, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহই নেই। দরকার শুধু উপযুক্ত পদক্ষেপ নেওয়ার।

যাঁরা নিজেদের ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে থেকে কয়েকটা দিন সময় বার করে ডুয়ার্সের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তে চাইছেন, তাঁদের পছন্দের তালিকায় সবার উপরে থাকতেই পারে ভুটানঘাট। আলিপুরদুয়ারের বক্সা বা জয়ন্তী থেকে ভুটানঘাট একদিনে অনায়াসে ঘুরে আসতে পারেন। বর্ষাকাল ছাড়া সারা বছরে যে কোনও সময় ভুটানঘাট ঘোরার উপযোগী হলেও বর্ষার পরবর্তী জঙ্গলের চিরসবুজ রূপটি আপনাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করবে। সমগ্র ডুয়ার্স ভ্রমণপিপাসু মানুষের কাছে দর্শনীয় হলেও ভুটানঘাটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ডুয়ার্সকে দেশের পর্যটন মানচিত্রে উপরের সারিতে জায়গা করে দিতে পারে। তার সঙ্গে যোগ করতে হয় বন্য প্রাণের কথা। বন্য প্রাণ বিশেষজ্ঞদের কাছে এলাকাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে জীববৈচিত্রের প্রাচুর্যর কারণে। কিন্তু ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করতে দরকার পর্যটন দপ্তরের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। আগামী দিনে যা এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে অনেকাংশে সাহায্য করবে।

**তমোঘ্ন সেনগুপ্ত**

# সাইলি পর্যটনকেন্দ্রের কাজ কি শুরু হবে?

ডুয়ার্সপ্রেমী জনগণ যদি বছর দুয়েক আগের স্মৃতি হাতড়ান তাহলে মনে পড়তে পারে, খবরের কাগজের প্রথম পাতায় মালবাজার সন্নিহিত সাইলির একটি নতুন পর্যটনকেন্দ্রের শিলান্যাস ঘিরে বেশ বড়সড় তরজার কথা। পরিবেশপ্রেমীদের বক্তব্য ছিল, হাতিদের চলাচলের প্রাচীন এই করিডরে কিছুতেই টুরিস্ট লজ হতে পারে না। আবার বেশ বড়সড় আর্থিক অনুমোদন পেয়ে উত্তেজিত জেলা প্রশাসন পালটা যুক্তি দিয়েছেন, এত বড় একটা প্রজেক্ট হাতির জন্য বন্ধ হয়ে যাবে? বেশ শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সেই সময়। এগিয়ে এসেছিল রাজ্য পর্যটন দপ্তর। বনকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিধান দিয়েছিল, আপাতত চেপে যাও। ক'টা দিন যাক, হইচই কমে গেলে ফের শুরু করা যাবে'খন। অতএব কয়েকটি কংক্রিটের খুঁটি পুঁতেই থেমে গেল কাজ। তবে তার মধ্যেই পোঁতা হয়েছিল বেশ কিছু দামি গাছের চারা। সেগুলি ক্রমশই কমতে কমতে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, বিবর্ণ হয়ে গেল সাইনবোর্ড, তবু শুরু হল না সাইলির প্রকল্প। ইদানীং কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, আবার চারাগাছ লাগাবার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসন। তবে কি এবার শুরু হবে সেই মেগা প্রকল্প? **নি.প্র.**

# নতুন ঠিকানা মাগুরমারি

রাজ্য পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে নির্মিত হোম স্টে ও কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী গৌতম দেব। তিন বছর আগে রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্ন্তগত ওঁরাও জনজাতিভুক্ত ৪০টি পরিবার অধ্যুষিত মাগুরমারি বনবস্তিতে আসেন ইউএনও-র এক প্রতিনিধি দল তাঁদের রিপোর্টে মাগুরমারিতে হোম স্টে-র সম্ভাবনার উল্লেখ দেখে রাজ্য পর্যটন দপ্তর উৎসাহিত হয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে দ্বি-শয্যার চারটি কটেজ ও একটি সুদৃশ্য কমিউনিটি হল তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিন দিকে গভীর বনানী, সামনে বিস্তৃত ধান ক্ষেত যা চা বাগানে গিয়ে মিশেছে— চতুর্দিকের এই সবুজ সমুদ্রের মাঝে নীল রঙের ছাউনি দেওয়া সুদৃশ্য কটেজ ও কমিউনিটি হল যেন এক স্বপ্নপুরী। অনিঃশেষ নিস্তব্ধতায় প্রকৃতি এখানে মগ্ন। এমন মনোরম পরিবেশের সঙ্গে যদি যুক্ত হয় ওঁরাও জনজাতির চিরাচরিত লাঠি নৃত্য ও বৈচিত্রময় যাত্রা-নাচ তবে পর্যটকদের কাছে অচিরেই যে মাগুরমারি হোম স্টে ডুয়ার্সের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণে পরিণত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বনবস্তিবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য গঠিত হয়েছে মাগুরমারি ইকো ট্রাভেলার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। যার সম্পাদক মাগুরমারির বাসিন্দা তথা রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সুমন ওঁরাও। পর্যটকদের দেখভাল, খাওয়া-দাওয়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনোরঞ্জনের দায়িত্বে রয়েছে এই সোসাইটি।

মালবাজার থেকে ওদলাবাড়ি হয়ে ক্রান্তি যাবার পথে প্রায় ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ গা ছমছম করা কাঠামবাড়ি ফরেস্ট পেরিয়েই কৈলাশপুর চা বাগানের বাস স্টপ। সেখান থেকে একটি কাঁচা রাস্তা কাঠামবাড়ি ফরেস্টের ধার ঘেঁষে কৈলাশপুর চা বাগানকে ডাইনে রেখে পৌঁছে গিয়েছে এক কিলোমিটার দূরের মাগুরবাড়িতে। গত ১৭ অক্টোবর এখানে

**যাতায়াত**— মাল, ওদলাবাড়ি বা লাটাগুড়ি (ভায়া ক্রান্তি) থেকে ছোটগাড়ি ভাড়া করে মাগুরমারি হোম স্টে-তে যাওয়া যায়। মালবাজার ৩০ কিমি, লাটাগুড়ি ১৮ কিমি।

**বুকিং**— মাগুরমারি ইকো ট্রাভেলার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি অথবা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অন লাইন বুকিং করা যাবে।

**ভাড়া**— দ্বি-শয্যার প্রতিটি ঘরে এক দিনে ১৫০০ টাকা।

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

# পশ্চিম ডামডিমে ইকো লজ প্রস্তুত

ডামডিম আর ওদলাবাড়ি সীমানার মাঝখান দিয়ে দুলকি চালে বয়ে চলেছে চেল নদী। পশ্চিম ডামডিমের জনবসতি পেরিয়ে চেল পশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের আপালচাঁদ বনাঞ্চল ছুঁয়ে ধনুকের মতো বেঁকে পুবমুখী হয়েছে। নদীর বাঁ প্রান্তে কয়েকশো ফুট আবাদি জমি ছাড়িয়ে রাজ্য পর্যটন দপ্তর গড়ে তুলেছে পশ্চিম ডামডিম পর্যটন কেন্দ্র। চারটি এক কক্ষ এবং দুটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট কটেজ এবং একটি অত্যাধুনিক রেস্টুরেন্ট নিয়ে গড়ে ওঠা এই পর্যটন কেন্দ্রের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। মালবাজার থেকে ডামডিম মোড় ঘুরে যে পথটি চা বাগানের বুক চিরে প্রায় ১৫ কিমি পারি দিয়ে পশ্চিম ডামডিমে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে যে এমন আধুনিক একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠতে

পারে স্থানীয় বাসিন্দারা কেউ কোনওদিন ভাবেনি। তাই এই পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে অর্থনৈতিক বিকাশের আশায় বুক বাঁধছে স্থানীয় বাসিন্দা তথা বর্তমানে এই পর্যটন কেন্দ্রটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা পিটার টোপ্পোর মতো অনেকেই। পর্যটকদের কাছে এই কেন্দ্রের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠতে চলেছে চেল নদীর পাড়ের আপালচাঁদ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা হাতির দল। পর্যটন কেন্দ্র থেকেই যাতে হাতির দলের দেখা মেলে সেজন্য একটি ওয়াচ টাওয়ারও তৈরি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার দিকটিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হাতির দল যাতে পর্যটন কেন্দ্রে চলে আসতে না পারে সেজন্য সুরক্ষা ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। ডামডিম মোড় থেকে পশ্চিম ডামডিম পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তা সংস্কারের কাজও দ্রুত শুরু হবে। আয়োজন সম্পূর্ণ। এখন শুধু উদ্বোধনের প্রহর গোনা।

**যাতায়াত**— মাল বা ডামডিম থেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করে পশ্চিম ডামডিম পর্যটন কেন্দ্রে যাওয়া যাবে। মালবাজার থেকে ১৫ কিমি এবং ডামডিম থেকে ৮ কিমি।

**নি.প্র.**

পর্যটনের ডুয়ার্স

# সরকারি টুরিস্ট লজগুলিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিষেবার ব্যবস্থা হোক

**গোটা রাজ্য জুড়ে যখন কর্মসংস্কৃতি নিয়ে সমালোচকরা গলা ফাটাচ্ছে তখন তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগমের কর্মীরা। তেমনই দাবি করছেন তাদেরই প্রতিনিধি। পশ্চিমবঙ্গ যখন বাকি দেশ থেকে অনেক কিছুতেই পিছিয়ে পড়ছে তখন এ রাজ্যেরই নিগম কর্মীদের দৃঢ় মনোবল প্রশংসার দাবি রাখে বইকি।**

সব মিলিয়ে চৌত্রিশটি ঘর, গত আর্থিক বছরে বিক্রি দু'কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ডুয়ার্সে একটি সমান সাইজের বেসরকারি লজের পক্ষে কি এই আয় করা সম্ভব? উত্তর, অবশ্যই না। কিন্তু সরকারি ছাপ থাকলেও পরিষেবার গুণমান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ একটি ফ্যাক্টর বলে দাবি জানালেন টুরিস্ট লজের ম্যানেজার নিরঞ্জন

সাহা। গত পাঁচ বছরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাদারিহাট টুরিস্ট লজের এই অভাবনীয় জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্যিক সাফল্য এসেছে। যে কারণেই হোক, জলদাপাড়া এলাকায় এই মাপের বেসরকারি লজ এখনও গড়ে ওঠেনি— ফলে সরকারি এই লজটি বহুদিন থেকেই পর্যটকের প্রধান ভরসা, সময়ের সঙ্গে তার কলেবর ও জনপ্রিয়তা পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। কাছাকাছি হলং লজ নানা অসুবিধা সত্ত্বেও এবং হালে পর্যটন দপ্তরের আওতায় এলেও, আজও মূলত ভিআইপি লজ হিসেবেই বেশি পরিচিত।

জনগণের ভরসার প্রতি সম্মান জানাতে হলে পরিষেবাকে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা উচিত বলেই মনে করেন নিরঞ্জন। যেমন হাতি সাফারি জলদাপাড়ার অন্যতম আকর্ষণ অথচ তার আসনসংখ্যা সীমিত ও নির্দিষ্ট। টুরিস্ট লজের ঘরসংখ্যা ৩৪ অথচ হাতি সাফারিতে আসন মেলে মাত্র বারোটি। সেখানে হলং লজের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে চব্বিশটি। হাতির সংখ্যা বাড়ানোর দাবি বহুদিনের, তার দায়িত্ব বন দপ্তরের। তেমনই তাঁর মতে গরুমারার মতো এখানেও হাতি বা জিপসি সাফারির টিকিট আগের দিনের পরিবর্তে সে দিনই দেওয়ার নিয়ম চালু হোক, এতে পিক সিজনের দিনগুলিতে না হলেও অন্য দিনগুলিতে বাইরে থেকে আসা ডে টুরিস্টরা সাফারির টিকিট পেতে পারেন। সেই সঙ্গে চালু হোক সরকারি উদ্যোগে প্রিপেড ট্যাক্সি সার্ভিস এবং ইনফরমেশন সেন্টার। নিরঞ্জনের মতে সরকারি ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আস্থা অনেক বেশি এবং ঠকবার ভয় পান না, ফলে তাঁদের নিশ্চিন্ত সমাগম ও ঘোরাফেরা বাড়তে পারে, যাতে আখেরে লাভ পর্যটনেরই।

তেমনই জলদাপাড়ার টুরিস্ট লজের মতোই নবনির্মিত মূর্তি লজেও পর্যটকদের জন্য লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো, ওয়াইল্ডলাইফ মুভি শো ইত্যাদি সান্ধ্য অবসরযাপনের বন্দোবস্ত হওয়া দরকার বলে মনে করেন নিরঞ্জন। মূর্তি টুরিস্ট লজের মূল ফটকের বাইরে নদীর ধারে সন্ধ্যায় অসামাজিক আড্ডা ঠেকাতে কিংবা পিকনিক বাহিনীর দৌরাত্ম্য বন্ধ করতে জায়গাটিকে বাঁধিয়ে ঘিরে দিয়ে টুরিস্ট পার্ক বানানোর প্রস্তাব তাঁরা জেলা প্রশাসনকে দিয়েছেন। কিন্তু তা নিয়ে এখনও কোনও উদ্যোগের ইঙ্গিত মেলেনি। নিজেকে পর্যটনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী বলে মনে করেন নিরঞ্জন, তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট, সরকারি পর্যটনে মানুষের আস্থা যখন একশো শতাংশ, তখন তাঁদের পরিষেবাকেও যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। তবে তিনি আশাবাদী, বন দপ্তর এখন অনেক বেশি মাত্রায় পর্যটনে আগ্রহী হয়েছেন। অতএব ছোটখাটো চাহিদাগুলি মিটবে অচিরেই।

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা

# তিন বিঘা লিজ চালু হতেই বাড়ল ভূমিদস্যুদের অত্যাচার

ছিটমহলগুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই যেমন ভিন্ন ভিন্ন মর্মস্পর্শী কাহিনি রয়েছে, তেমনই নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যাঁরা সেখানে মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও কম নয়। মৌলবাদ মদতপুষ্ট ভূমিদস্যুদের অত্যাচার চরমে উঠলে প্রকৃতির নিয়মেই যেন জন্ম নিল প্রতিরোধশক্তি। **পঞ্চম পর্বে** তারই সূচনা।

উৎখাত হওয়া ছিটবাসীদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। কেউ বলেন ১২ থেকে ১৫ হাজার, আবার কারও মতে তা ২০ হাজারের বেশি ছাড়া কম নয়। তিন বিঘা লিজ কার্যকর হওয়ার পর থেকেই এপারে আসার সংখ্যাটি ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমান পঞ্চগড় ও নীলকামারি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছিটগুলির বহু মানুষই বৃহত্তর শিলিগুড়ি কিংবা শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে অবস্থিত ছোট-বড় জনপদকে আবাসভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। অন্য দিকে, বাংলাদেশের অপর দুই জেলা, যথাক্রমে লালমণিরহাট ও কুড়িগ্রামের অভ্যন্তরস্থ ছিটের বাসিন্দাদের অনেকেই মেখলিগঞ্জ, মাথাভাঙা, ফালাকাটা, ধূপগুড়ি কিংবা দিনহাটার প্রত্যন্ত গ্রামে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছেন। স্থানীয়ভাবে তাঁরা পরিচিত ছিটের লোক হিসেবে। তবে উৎখাত হওয়া ছিটবাসীদের সংগঠিত আন্দোলনের

ভূমি হিসেবে হলদিবাড়ি হচ্ছে অগ্রগণ্য। উৎখাত হওয়া বা উদ্বাস্তু ছিটবাসীদের প্রায় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই যেমন ভিন্ন ভিন্ন মর্মস্পর্শী কাহিনি রয়েছে, সেরকম ছিটমহলগুলিতে যাঁরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও কিছু কম নয়।

এ ক্ষেত্রে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয়, তিনি হলেন ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলের বলরাম বর্মন। পেশায় কৃষিজীবী বলরামবাবুর বাসস্থান বর্তমান বাংলাদেশের লালমণিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলার জোংড়া ইউনিটের অভ্যন্তরে। উনসত্তর বছর বয়স্ক বলরামবাবুর বসবাস ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলে। বংশপরম্পরায় তাঁদের পেশা কৃষি। কিন্তু তাঁদের বিপুল সংখ্যক জমি বেদখল হবার পর ছিটমহল সংলগ্ন সরকারের হাটে মোটর সাইকেল সারাইয়ের কাজ করে সংসার প্রতিপালন করেন বলরামবাবু। ব্রিটিশশাসিত বাংলায় সাবেক এই কোচবিহারি ছিটমহলে যেমন তাঁদের আবাদি জমি ছিল, সেরকম ছিটমহল সংলগ্ন ব্রিটিশশাসিত জলপাইগুড়ি জেলার পাটগ্রাম থানার অভ্যন্তরে বিপুল সংখ্যক জমির মালিক ছিলেন তাঁরা। অর্থাৎ এক কথায় তাঁদের বসবাস ছিল সাবেক পাটগ্রাম চাকলায়। হয়ত বা তাঁরা ছিলেন মহারাজার জ্ঞাতি নাজিরের বংশধর কিংবা আত্মীয়-পরিজন। ১৭৭৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রংপুরের কালেক্টর মি. চার্লস পার্লিং 'হস্ত-ও-রজের' সময় (Assessment বা রাজস্ব নির্ধারণ) এই খণ্ড খণ্ড ভূভাগের উপর মহারাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার কারণেই সৃষ্ট এই সকল ভূভাগ মূলত মহারাজার জ্ঞাতি কিংবা আত্মীয়স্বজন বা নাজিরের বংশধরদের একান্ত নিজস্ব বাসভূমি হিসেবেই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তী সময়ে এই খণ্ড গ্রামগুলি হল ছিটমহল। রাজন্যশাসিত কোচবিহারে এই সকল ভূখণ্ড রাজস্ব নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় 'পেটভাতা' ভূমি হিসেবে পরিচিত ছিল। 'পেটভাতা' ভূমির সংজ্ঞায় ১৮৮৪ সালে কোচবিহার স্টেট প্রেস থেকে মুদ্রিত ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক লিখিত গ্রন্থ 'কোচবিহারের ইতিহাস'-এ উল্লেখ রয়েছে যে, 'রাজা তাঁহার জ্ঞাতি ও আত্মীয়গণের ভরণপোষণের জন্য তাঁহাদের জীবিতকাল পর্যন্ত কতক জমি দান করিয়া থাকেন। প্রথম প্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের পুনঃ প্রদান গ্রাহ্য না হইলে উত্তরাধিকারিগণকে সাধারণত জোত স্বরূপে ওই জমি দেওয়া হয়। অন্যান্য জোতদারগণের ন্যায় তাহাদেরও প্রচলিত খাজনা দিতে হয়। পেটভাতা জমির স্বত্ব হস্তান্তর করা যায় না।' অর্থাৎ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ১৭৭৩ সালে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হবার পর করদমিত্র রাজ্য কোচবিহারের পাটগ্রাম চাকলা ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার সময় পাটগ্রাম চাকলার অভ্যন্তরে থাকা পেটভাতা ভূমি সকল ছিটমহল নাম পরিগ্রহ করে। বলরাম বর্মনের পূর্বপুরুষরা উক্ত পেটভাতা জমির রায়ত হিসেবে তা ভোগদখল করার সুবাদে ছিটমহল নামক ভূভাগে বসবাস করতে থাকেন। পেটভাতা ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রের জমিগুলি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে পাটগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতালাভের মুহূর্তে তৎকালীন জলপাইগুড়ি জেলার ৫টি থানা, যথাক্রমে—বোদা, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে বলরামবাবুদের পূর্বপুরুষের ভোগদখল করা 'পেটভাতা' ভূমি তখন থেকে নতুন আঙ্গিকে পূর্ব পাকিস্তানের পাটগ্রাম থানার অভ্যন্তরে কোচবিহারি তথা ভারতীয় ছিটমহল হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। পাশাপাশি পাটগ্রাম থানার অন্যান্য জমি সকল পাকিস্তানি জমি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের পর যা বাংলাদেশি ভূখণ্ডে পরিণত হয়। যা-ই হোক, বলরামবাবুদের পরিবার দেশভাগের পরেও বেশ কিছুকাল নির্বিঘ্নেই বসবাস করতে থাকেন পাটগ্রামের জোংড়া এলাকায়। ১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তি তাঁদের উদ্বেগ বৃদ্ধি করলেও তাঁরা মাটি কামড়ে সেখানেই পড়ে রইলেন। ১৯৫৯ সাল থেকে ভারত-চিন সম্পর্কের অবনতির প্রভাব ভারত-পাকিস্তান সীমান্তকে ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করে। ১৯৬২ সালের ভারত-চিন যুদ্ধ পরিস্থিতিকে তলানিতে পৌঁছে দেয়। বেরুবাড়ি ও দহগ্রামে ভারত ও পাকিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে কয়েক দফার গুলি বিনিময় এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাক যুদ্ধের পটভূমিতে পাটগ্রাম এলাকার একদল ভূমিদস্যু বলরামবাবুর পরিবারের বিপুল পরিমাণ জমি দখল করে নেয়। তখন বলরামবাবুর বয়স ১৭/১৮ বছর। ছিটমহলের কিছু জমি কোনওক্রমে দখলে রেখে তাঁরা জীবন নির্বাহ করতে থাকেন। এর পর মুক্তিযুদ্ধ, অতঃপর ১৯৭১ সালে আত্মপ্রকাশ ঘটল স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের। নতুন দেশ, নতুন সমীকরণ। আশায় বুক বাঁধলেন ছিটমহলের মানুষরা। নতুন করে ছিটমহল তথা সীমান্ত সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ করল ভারত ও বাংলাদেশের স্থলসীমা চুক্তি। 'ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি' নামে খ্যাত এই সমঝোতায় বাংলাদেশের দু'টি বৃহত্তম ছিটমহল দহগ্রাম ও আঙ্গারপোতার সঙ্গে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সংযোগ গড়ে তুলতে তিন বিঘা করিডর স্থাপন ও অবশিষ্ট ছিটমহল বিনিময় অন্তত ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের মনকে প্রসন্ন করেছিল বলে মনে হয় না। অন্তত বলরামবাবুদের কথায় সেটাই ধরা পড়ে। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল, ভারতীয় ছিটমহলগুলির মধ্যে যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব মূল ভূখণ্ডের করিডর স্থাপন এবং তাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করা।

যা-ই হোক, তিন বিঘা করিডর লিজ কার্যকর হবার পর অন্য ভারতীয় ছিটমহলগুলির মতোই পাটগ্রামের অন্তর্গত বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের পরিস্থিতি ক্রমশ চলে যায় ভূমিদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার তৎকালীন শাসকদল বিএনপি ও জামাত শিবিরের প্রত্যক্ষ মদতে জোংড়া ইউনিয়নের জনৈক কর্মকর্তা শাহিন মিঞা ও তাঁর দলবল ছিটমহলবাসীদের জমি থেকে উৎখাত করে তার দখল নেবার অভিযানে নামে। বাঁশকাটা ছিটের মধুসূদন চক্রবর্তীর পরিবারের বিপুল পরিমাণ জমি ভূমিদস্যুরা ছলে-বলে-কৌশলে দখল নিতে সব ধরনের চেষ্টা চালায়। ভূমিদস্যুরা নানা ধরনের নির্যাতনও চালায় এই ব্রাহ্মণ পরিবারটির উপর। তাঁদের ছয়শত বিঘা জমি বেদখল হয়ে যায়। অবশেষে তাঁরা মূল ভূখণ্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। একই অবস্থার শিকার হন বাঁশকাটা ছিটের নরেন্দ্রনাথ মাঝির পরিবার। তাঁদের চারশত বিঘা জমি দখল করে ভূমিদস্যুরা। পরিশেষে তাঁরাও ছিট পরিত্যাগ করে মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হন। ব্রাহ্মণ পরিবারটি ফালাকাটায় এবং মাঝি পরিবারটি জটেশ্বরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পাটগ্রাম এলাকার আরও অনেকেই

---

তিন বিঘা করিডর লিজ কার্যকর হবার পর অন্য ভারতীয় ছিটমহলগুলির মতোই পাটগ্রামের অন্তর্গত বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের পরিস্থিতি ক্রমশ চলে যায় ভূমিদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে। ভূমিদস্যুরা ছলে-বলে-কৌশলে দখল নিতে সব ধরনের চেষ্টা চালায়। পরিশেষে তাঁরা ছিট পরিত্যাগ করে মূল ভূখণ্ডে চলে আসতে বাধ্য হন।

এই অঞ্চলে স্থায়ী বসতি গড়ে চলে আসতে বাধ্য হন।

বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের অন্যতম ১১৫ বাঁশকাটা ছিটের বাসিন্দা বিশ্বেশ্বর বর্মন ৩৬ বিঘা জমির মালিক ছিলেন। তাঁর জমির উপর নজর পড়ে মৌলবাদী শক্তির মদতপুষ্ট ভূমিদস্যুদের। ২০০৫ সালে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের অত্যাচার চরমে উঠলে তিনি প্রাণ বাঁচাতে মাথাভাঙার চ্যানাকাটা মোড়ে (শিকারপুর) আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে ও তিন মেয়েকে নিয়ে চ্যানাকাটা মোড়ে বসবাস করছেন। পেশায় হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক বিশ্বেশ্বরবাবু এখন মাথাভাঙার স্থায়ী বাসিন্দা।

২০০৪ সালে মাথাভাঙা ১ নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বাঁশকাটা ছিটগুচ্ছের ৪ জনকে স্থানীয় পঞ্চায়েত মনোনীত করেন। এঁরা হলেন— খোকানাথ বর্মন (১২১ নং বাঁশকাটা ছিট) মজেন্দ্রনাথ রায় (১১৯ নং বাঁশকাটা ছিট), উকিলচন্দ্র বর্মন (১১৯ নং বাঁশকাটা ছিট) ও বিশ্বেশ্বর বর্মন (১১৫ নং বাঁশকাটা ছিট)। ২০০৪ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত এই চার পঞ্চায়েত কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র নিয়ে ছিটবাসীরা মূল ভূখণ্ডে এসে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করতে পারতেন। এমনকি জমিজমা রেজিস্ট্রি পর্যন্ত। কিন্তু ২০০৬ সালের পর থেকে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কড়াকড়িতে তা বন্ধ হয়ে যায়। এক সময় একই ব্যবস্থা ভারতীয় ছিটমহল শালবাড়ি, কাজলদিঘি, নাজিরগঞ্জ, পুটিমারি, দেখাতা, নটকটকা, বেটেলাডাঙা কিংবা দাশিয়াছড়া ছিটমহলে চালু ছিল। পরে তাও বন্ধ হয়ে যায়।

ছিটমহলগুলিতে যখন ভূমিদস্যুদের দৌরাত্ম্যে ছিটবাসীরা অতিষ্ঠ, তখন পাটগ্রাম থানার অভ্যন্তরে শুরু হয় ছিটমহলবাসীদের নিজস্ব সংগঠন গড়ার প্রস্তুতি। ২০০৫ সালের ১৮ নভেম্বর ৪ নং বড়খেঙ্গির ছিটমহলে অনুষ্ঠিত সভায় ৪২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে গঠিত হয় ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের নিজস্ব সংগঠন ভারতীয় ছিটমহল ঐক্য পরিষদ 'ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল'। সংগঠন হিসেবে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরেই ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের তরফে কোচবিহারের জেলাশাসককে এক স্মারকলিপি প্রদান করে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেন ভারতীয় ছিটমহলের বাসিন্দারা। স্মারকপত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশি সন্ত্রাসী মহলের চক্রান্তে ছিটমহলের জমিজমা দখলের উদ্দেশ্যে ভূমিদস্যুরা ছিটমহলে প্রবেশ করে। নানা অজুহাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি, ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুঠ, মহিলাদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি ঘটনা ঘটিয়ে ছিটবাসীদের জমির কাগজপত্র কেড়ে নেয়। পরবর্তীতে তারাই উক্ত জমির উপর মিথ্যা দাবি নিয়ে মালিক সেজে জোরপূর্বক জমি দখল করার অভিযানে মত্ত হয়েছে। বর্তমানে ছিটমহলের প্রকৃত বাসিন্দাদের উৎখাত করে সেই জমি দখলের বিরাট ষড়যন্ত্রের কথাও তাঁরা স্মারকপত্রে কয়েকটি উদাহরণসহ উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে, অবাধে মূল ভূখণ্ডে আসা-যাওয়ার মধ্যে দিয়ে জমিজমা নথিভুক্তিকরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে জমির খতিয়ান ও দলিলের নকল সংগ্রহ এবং সর্বোপরি ভারতের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার প্রদানের দাবি তাঁরা জেলাশাসককে লিখিতভাবে জানান।

চরম প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে ভারতীয় ছিটবাসীদের এই অসম লড়াই বাংলাদেশি ভূমিদস্যুদের ত্রস্ত করে তোলে। শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র এবং পালটা সংগঠনের মাধ্যমে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের শায়েস্তা করার নতুন পন্থা অন্বেষণের প্রয়াস। এ ক্ষেত্রে তাদের মস্ত হাতিয়ার ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি। পাশে বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তির প্রত্যক্ষ মদত। যদিও অসম লড়াই জারি রাখে ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিল।

**দেবব্রত চাকী**

(ক্রমশ)

# দীপাবলীর শুভলগ্নে ডুয়ার্সের মানুষকে আলোকোজ্জ্বল অভিনন্দন

**গ্রা**মীণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত উন্নয়ন দপ্তর। তারই অংশ হিসেবে বিগত কয়েক বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় আমরা মানুষের প্রত্যাশা যৎসামান্যই পূরণ করতে পেরেছি, বহু কাজ এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। তবু এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কর্মীরা যতটুকু কাজ করতে পেরেছে, উন্নয়নের নিরিখে তা কম কিছু নয়। দরিদ্র মানুষের আত্মসচেতনতা তৈরি হয় তার আশপাশের এলাকার উন্নয়ন ও প্রগতির মধ্য দিয়ে, সে তার নিজের ভালমন্দ বুঝতে শেখে, নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নেওয়া তার অধিকারের মধ্যেই পড়ে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রত্যন্ত এলাকার মানুষগুলির চলাফেরা ও বেঁচে থাকায় স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসবার জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি প্রতিবার গ্রহণ করে তার বেশিরভাগটাই সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা, রাস্তাঘাট, পাকা সেতু, স্বনির্ভর প্রকল্প, ঋণদান ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান-ফিরিস্তি পরে কোনও এক সময় দেওয়া যেতে পারে। আপাতত আসন্ন দীপাবলীর শুভ লগ্নে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত তথা সমগ্র ডুয়ার্স এবং বাংলার মানুষকে হার্দিক অভিনন্দন জানাই। দারিদ্র, বঞ্চনা ইত্যাদির যাবতীয় ক্ষোভ-দুঃখ ভুলে গিয়ে আসুন সবাই মিলে গ্রামীণ বাংলার উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই।

উদয় সরকার
প্রধান

## পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত, মাথাভাঙা

**ধারাবাহিক কাহিনি**

# তরাই উৎরাই

১২

ইছামুদ্দিন নামটা বড়, তাই লোকে তাকে ইছাই বলে ডাকে। ইছাই মুসলিম ব্যাপারটা হয়ত জানে, কিন্তু লিগ জানে না। গ্রামের মুনশি তাকে সুযোগ পেলেই বোঝায় মুসলিমদের করণীয় কী হওয়া উচিত। ইছাই শোনে। কিন্তু মুশকিল এই যে, পেটে দানাপানি ঠিকমতো না পড়লে যে ঝিমুনি ভাবটা শরীরে শামুকের খোলার মতো জড়িয়ে থাকে, সেটা দূর করার জন্য চাই পয়সা আর চাল। দিনে পাঁচবার না হলেও সকাল-সন্ধে আল্লার নাম করা যে উচিত তা মানে ইছামুদ্দিন। তবুও সময় হচ্ছে কোথায়? তার না আছে জমি, না আছে নৌকো। দু'-চারটে মুরগি-পাঁঠা যে পালবে— সেটাও হয় না। নদীর চর থেকে ঘাস কেটে এনে কোনওমতে ঘরে জল পড়া বন্ধ করেছে। অবশ্যি চাইলে খানিকটা পাট যে মেলে না তা নয়। পাটের কাঠিও দু'-চার বান্ডিল পেয়ে যায় একে-ওকে ধরে। তা দিয়ে ঘর বলে একটা খেলনা সে বানায় ফি-বছর। সে খেলনা ঘরের দেওয়াল ভেদ করে মাঘের বাঘ কাঁপানো ঠান্ডা বউ-বাচ্চা সমেত তাকে কুণ্ডলী বানিয়ে ফেলে মাঝরাতে। উঁচু মাচার উপর পোয়াল ঢেলে বানিয়ে নেওয়া বিছানার কোনা ভিজতে থাকে বর্ষার রাতে। একদিক দিয়ে বিচার করলে গরমের দিন ক'টাই একটু স্বস্তি।

ভোরবেলায় যখন মুনশির মতে নমাজের সময়, তখন ইছামুদ্দিন বার হয় টাউনের পথে। তিন মাইল উজিয়ে এসে দাঁড়ায় দিনবাজারের কাছে। সবে দোল উৎসব শেষ হয়েছে। রাস্তায় আবিরের দাগ লেগে আছে এখনও। নদীর ধারে ধোপার দল কাপড় বোঝাই পেল্লায় বোঁচকাগুলি বয়ে আনছে। ইছামুদ্দিন পুলের কাছে জলিলের ফলের দোকানের পাশে এসে দাঁড়ায়। একটা কড়াইতে কয়েক টুকরো কয়লা জ্বালিয়ে রাখে জলিল। পাশে হুঁকো। সেখানে দু'-তিন টান দিতে পারে ইছামুদ্দিন। জলিল ছোট একটা কাঠের টুলে বসে কলার কাঁদি থেকে নষ্ট হতে থাকা কলাগুলো আলাদা করে রাখছিল। আজ কোনও কারণে তার মেজাজ একটু ভালই দেখাচ্ছিল। ইছামুদ্দিনের দিকে দুটো দাগ ধরা কলা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বস ইছাই। আজ তোর বুকিং আছে।'

মজুর হিসেবে ইছাইয়ের যে অল্প অল্প খ্যাতি আছে, সেটা জলিল জানে। এ তল্লাটে মুসলিমদের সিংহভাগই তো মজুর। ছোটবেলা থেকেই খাটতে শেখে। তারপর খাটতে খাটতে অকালে বুড়িয়ে কবরে চলে যায় একদিন। প্রায় নেংটি পরে থাকা ছিন্ন লুঙ্গি আর গায়ে একটা গামছা জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ইছামুদ্দিনের বয়স আর কত হবে? তিরিশও না। অথচ দেখাচ্ছে যেন পঞ্চাশ পেরিয়ে যাওয়া বুড়োর মতো। পাঁচটা সন্তানের একটা মরেছে কালাজ্বরে। ম্যালেরিয়ায় আরও দুটো শুকিয়ে প্রায় কঞ্চি। বউটাকে দেখলে কেউ বলবে না যে সে অষ্টাদশী।

জলিল বোঝে এসব। সে নিজেকে ভাগ্যবান ভাবে। ফলের ব্যবসা করে সে ঘরবাড়ি বানিয়েছে। দু'বেলা ভালমন্দ খাচ্ছে। মেলা-মচ্ছবে মিঠাই কিনছে বাচ্চাদের জন্য। ইদের সময় বাড়ি সাজাচ্ছে— এসব ভাগ্য সহায় না হলে হত না তার। ইছামুদ্দিনের মতো অকালে শুকিয়ে মরার আগে দিনবাজারের পুলের কাছে দিনমজুরির কাজের জন্য হাপিত্যেশ করে হয়ত তাকেও দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

দুটো কলা খেয়ে ইছামুদ্দিন আনন্দ পায়। তামাক টেনে হাসিমুখে জানতে চায় তার বুকিং-এর কথা। জলিল অবশ্য বলার সুযোগ পাচ্ছে না। কারণ আব্দুস সাত্তারের বাজার সরকার মুটের মাথায় পেল্লায় ঝুড়ি চাপিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। গতকাল বিকেলে রায়গঞ্জ হয়ে এক গোরুর গাড়ি বোঝাই আম এসেছে শহরে। গোটাটাই কিনে নিয়েছে জলিল। বাজার সরকার সেই আমের ঝুড়িগুলো দেখতে দেখতে নাক কুঁচকে বললেন, 'কী রে জলিল! ফাগুন না ফুরাতেই আম নিয়ে এসেছিস? ওগুলো মাটির নাকি?'

মাটির যে নয়, তা বোঝাতে একটা আম থেকে খানিকটা কেটে এগিয়ে দিয়েছে জলিল। সরকার সেটা চুষছেন। মুখ দেখে মনে হচ্ছে স্বাদটা তাঁর পছন্দ হয়েছে। মনে হয় বেশ খানিকটা নেবেন।

'ভাল আম। এই তো বিজয় হাওলাদার তিন ঝুড়ি নিয়ে গেলেন।'

বিজয় হাওলাদার অবশ্য খুব কেউকেটা ব্যক্তি নন। কিন্তু তাঁর উদাহরণটা কাজে দিল। আবদুস সাত্তারের বাজার সরকার ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ঝুড়ি-টুড়ি বাদ দে জলিল। শ'তিনেক গুনে দে। ফাউ দিস কয়েকটা আর আমার জন্য শ'খানেক। আমারটার দাম কিন্তু বুঝেসুঝে বলবি।'

জলিল আম গুনতে শুরু করল। বাজার সরকার এগিয়ে গেলেন অন্য দিকে। গুনতি নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। কেউ ঠকাবে না।

সরকার চলে গেলে ইছামুদ্দিন বিস্ময়ের সুরে বলল, 'তিনশো আম! উয়ার আজি খালি আমই খাবে!'

'আরে না না!' জলিল হাসিমুখে জানায়। 'শুনছি লিগের লোকজন আসবে সাত্তার সাহেবের কাছে। মিটিং হবে। এই সময় এমন আম পাইলে মেজাজ ঠান্ডা থাকবে সবার।'

'লিগ কথাটা তো মুনশিও কসে। তুই বুঝিস?'

'ওই একটা পার্টি আর কী। আমাদের ভাল হবে। সাত্তার সাহেবের লোকজন তো তা-ই বলে।'

দেখতে দেখতে চারশো আম দু'ভাগে ভাগ করে ঝুড়িতে সাজিয়ে বেঁধে তৈরি করে রাখে জলিল। বাজার জমে উঠেছে। ধুতি-চাদর গায়ে বাবুদের দেখা যাচ্ছে একে একে। একটু অসময়ের আম দেখে লোকজন জমছে

একটি-দু'টি করে জলিলের দোকানের সামনে। কিনছেও কেউ কেউ। দাম একটু চড়া শোনালেও ইছামুদ্দিন দেখছে হাসিমুখে পয়সা বার করে দিচ্ছে লোকজন। সারাদিন খেটে ইছামুদ্দিন খুব বেশি হলে যা পাবে, তার চাইতে অনেক বেশি পয়সা শুধু আম কিনতেই দিয়ে দিচ্ছে মানুষ। ইছামুদ্দিন মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকে। তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা ভারী সুন্দর কল্পনার দৃশ্য। দিনের শেষে শহর থেকে গ্রামের পথে হেঁটে ফিরছে সে। সূর্য ডুবে গিয়েছে, তবুও আলো আছে চারধারে। নরম ঠান্ডা আলো আর শিরশিরে বাতাস। মাথায় এক ঝুড়ি আম নিয়ে পথ ধরে ঘরে ফিরছে ইছামুদ্দিন। মুনশি নমাজ পড়ছে। সেই সুর কানে নিতে নিতে ফিরছে ইছামুদ্দিন পরম আনন্দে। বাচ্চাদের সামনে আমের ঝুড়ি নামিয়ে রেখে বিবি বলছে যত খুশি খেতে। বাচ্চারা উত্তেজনায় পাগল। যত খুশি যে খাওয়া যায়, সেটা শুনছে তারা। বিবিও বলছে প্রথমবার।

কিন্তু ইছামুদ্দিনের কল্পনার দৃশ্য মুছে দিয়ে কে যেন তাকে ডাকে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে হিদারু। শেষ পুজোর সময় কয়েকদিন এর বাড়িতে মজুরি খেটেছিল ইছামুদ্দিন। ভাল লোক। নগদ এক টাকা বেশি দিয়েছিল ওর বাপ। আর অনেকটা চাল। ব্যবহারও ভাল করেছিল তার সঙ্গে। তাই কল্পনা মিলিয়ে গেলেও ইছামুদ্দিন অখুশি হল না। জলিল একটু ফুরসত পেয়ে হুঁকোয় দুটো টান মেরে বলল, 'ওই তোর বুকিং আসছে। চলে যা। দু'-তিন দিনের কাজ আছে।'

গামছাটা গলায় পেঁচিয়ে নিয়ে হিদারুর সঙ্গে হাঁটতে থাকে ইছামুদ্দিন। বাজার তখন জমে গিয়েছে লোকজন, মুটেমজুর, ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার গাড়িতে মুখর হয়ে উঠেছে করলা নদীর পাড়। আর সেই মুখরতাকে খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা হাতি হেলতে-দুলতে এসে দাঁড়িয়েছে খানিকটা দূরে একটা বড় গাছের নিচে। হাতি ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। শহরে হাতি চেপে টুকটাক লোকজন ঘুরে বেড়ায়। পুলিশেরও হাতি আছে ঘরবাড়ি ভেঙে দেওয়ার জন্য। কিন্তু গোপাল ঘোষ হাতি চেপে বাজার করতে আসবে— এটা বাজারের জনতার কাছে একটু আশ্চর্যের। এটা ঠিক যে গোপাল ঘোষের মেলা পয়সা। কিন্তু শহরে জোর গুজব ছিল যে, তিনি গাড়ি কিনে কংগ্রেস পার্টিতে যোগ দেবেন। কেউ কেউ বলছিল যে, কলকাতা থেকে সে গাড়ি ট্রেনে এর মধ্যেই রওনা দেবে জলপাইগুড়িতে।

অথচ এলেন হাতিতে! হাতিখানা অবশ্য চকচকে আর স্বাস্থ্যবান। মাহুতের পাগড়িটা দেখার মতো। হাওদাখানাও জম্পেশ। বোঝাই যাচ্ছে যে গোপাল ঘোষ হাতিকে যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে কিপটেমি করছেন না। ফলত, তিনি যখন ঘিয়ে রঙের ধুতি আর মিহি চাদর গায়ে হাতির পিঠ থেকে নেমে কোমরের কারণে একটু বেঁকে আর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চারপাশে ছোটখাটো ভিড় জমে গেল। আবদুস সাত্তারের বাজার সরকার সেই ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অসন্তুষ্ট স্বরে বিড়বিড় করে বললেন, 'অ্যাঁ! গাড়ির জায়গায় হাতি! দেখব ক'দিন ভরপুর খোরাগ জোগাতে পারিস!'

১৩

হ্যাঁ! হাতিই কিনে ফেলছেন গোপাল ঘোষ। তিনি অনেক ভেবে, ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, তীর্থে এখনই যাওয়াটা উচিত হবে না। ম্যাট্রিক ফেল করলেও গদাধর কর্মকারের বুদ্ধি-বিবেচনার জুড়ি নেই। তা ছাড়া সে জানে বিস্তর। গোপাল ঘোষ কংগ্রেস করার কথা ভাবছেন জেনে সে এক আজব জিনিস বুঝিয়েছে। সেটা হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। কার্ল মার্কস বলে এক সাহেবের কথাও বলেছে। রাশিয়াতে কীভাবে জারের গণেশ উলটেছে, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সেখানে কীভাবে তাক লাগানো কাজ করছে— সেটাও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে বুঝিয়েছে গদাধর। গোপাল ঘোষ বোঝেননি। কিন্তু যেটা বুঝেছেন, সেটা খুব গোলমেলে। কংগ্রেস দিয়ে নাকি মার্কসের কাজ হবে না। গান্ধিজি উঁচু দরের নেতা, কিন্তু দ্বন্দ্বমূলক ব্যাপারটা নাকি তাঁর মধ্যে নেই। গোপাল ঘোষ চুপচাপ গদাধরের বক্তব্য শুনলেও গান্ধিজির কথাটা ওঠায় একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, 'নেই তো নেই, তা কী হয়েছে? তিনি কি মার্কসবাবুকে পছন্দ করেন না?'

গদাধর কর্মকার দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়েছিল, 'না। তিনি জমিদারদের পছন্দ করেন। মার্কস করেন না।'

'তাহলে মার্কসবাবুকে এখানে আসতে না করে দাও গদাধর। জমিদারদের টাকা না পেলে মুভমেন্ট হবে কী করে!'

গদাধর থতমত খেয়ে চুপ করে যেতেই গোপাল ঘোষ ঠিক করে ফেলেছিলেন যে তিনি জমিদার হবেন। এর জন্য দরকার একটা হাতি আর একটা সাজানো-গোছানো বজরা। করলা নদী বেয়ে ঘুরে বেড়াবেন সে বজরায় চড়ে। যতই কলের গাড়ি বলো না কেন, বজরা আর হাতি চেপে এলে লোকে মান্য করে বেশি। আর জমিদারের মতো একটা ভাবও আসে চেহারায়। অরণ্যের গভীর থেকে গাছ কেটে আনার কারণে হাতি নিয়ে গোপাল ঘোষের ভালই ধারণা আছে। তাই দেরি না করে অসমে লোক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই এসেছে হাতি আর মাহুত। বজরা তৈরি হচ্ছে। পয়লা বৈশাখে জলে নেমে যাবে।

সেই হাতি নিয়েই দিনবাজার হয়ে গোপাল ঘোষ যাচ্ছিলেন হাসপাতালের পাশ দিয়ে। উলটো পাশে ঘন জঙ্গল সাফাই করে জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল তৈরি হচ্ছে। পাশে বিরাট মাঠ। তাঁর ইচ্ছে ছিল সোজা যাবেন কাছারির দিকে। কিন্তু দোলের পর এখনও শহর তেমন জাগেনি বলে উকিলবাবুরা আজ বোধ হয় অনেকেই সেখানে যাবেন না। সুতরাং আয়রন হাউসের সামনে বিরাট জলাজমিটার পাশে একটা গাছের ছায়ায় হাতিকে দাঁড় করাতে বলে তিনি একটু চিন্তা করতে লাগলেন। গদাধরকে সে দিন ধমকে থামিয়ে দিলেও গোপাল ঘোষ খোঁজ নিয়ে জেনেছেন যে গান্ধিজির মতো মার্কসবাবুরও ভক্ত শহরে একটা-দুটো করে গজাচ্ছে। আর এটা ঠিক যে মার্কসবাবু বড়লোকদের পছন্দ করেন না। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ নাকি জমিদার দেখলেই টাকাপয়সা কেড়ে নেওয়ার কথা বলে। ব্যাপারটা ভাবনার। কিছুদিন আগেও দল ছিল একটাই। তারপর মুসলিম লিগের কথা শোনা যেতে লাগল। টাউনের অনেক রাশভারী মুসলিম মন দিয়ে লিগের প্রচার করছেন। এর পরে যদি মার্কসজির দল চলে আসে, তবে তো সমস্যা হবে। গোপাল ঘোষ এই সমস্যাটা অস্বীকার করতে পারছিলেন না। এতদিন জানতেন জমিদারদের লোকে মান্যগণ্য করে। কলকাতায় রবি ঠাকুর বলে যে বিখ্যাত কবির কথা তিনি শুনেছেন, সেও নাকি জমিদার। তাই গোপাল ঘোষও সে পথে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় জমিদার তাড়ানোর কথা শুনলে চিন্তা হওয়ারই কথা।

গোপাল ঘোষ ঠিক করলেন খুদিদার বাড়িতে যাবেন। এই লোকটির উপর গোপাল ঘোষের বেশ ভরসা। বেশ কয়েকবার মামলা লড়ে বাঁচিয়ে দিয়েছেন তাঁকে। দরকার হলে ফি দিয়ে এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাবে তাঁর কাছ থেকে। এটা আইন হতে যাচ্ছে কি না, সেটা জানা দরকার। বিপ্লবীরা মাঝে মাঝেই সাহেবদের উপরে হামলা করে। মার্কসবাবুর উপর হামলা করবে কি না, সেটা আলোচনা করতে হবে।

অতএব, হাতি এগতে লাগল নরেন ভিলার পাশ দিয়ে কালীবাড়িকে ডাইনে রেখে গাছপালায় মোড়া কাঁচা রাস্তাবহুল শহরের মধ্য দিয়ে, ক্লাইভ স্ট্রিটকে উত্তরে রেখে পশ্চিমে কদমতলাগামী পথে। আধ ঘণ্টা পরে দেখা গেল খুদিদার বৈঠকখানায় বসে তিনি চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে পা নাচাচ্ছেন। খুদিদা স্নানে গিয়েছেন। বাড়ির প্রশস্ত উঠোনের কোণে হাতিটা দাঁড়িয়ে কান নাড়াচ্ছিল। বেশ কয়েকটা বাচ্চার সঙ্গে দৃশ্যটা জানলা দিয়ে উপভোগ করছিল শোভা। হাতিটাকে দেখলেও শোভা আসলে অপেক্ষা করছিল ডাকপিয়োনের। সকালের ডাকে লালমণির হাটে কাজ করতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া দাদাটির যদি কোনও চিঠি থাকে। নিরুদ্দেশ ছাড়া আর কী হতে পারে! শোভা যাওয়ার পরপর একটা চিঠি এসেছিল। তাতে

কোনও ঠিকানা না থাকায় চিঠির উত্তর দেওয়া যায়নি। তারপর তিন মাস হল দ্বিতীয় কোনও চিঠি নেই। গোড়ায় বিষয়টা নিয়ে তেমন গুরুত্ব না দিলেও দিনে দিনে চিন্তা বেড়েছে। এখন সে চিন্তা বদলে যাচ্ছে দুশ্চিন্তায়। কলকাতা থেকে ছেলের খবর জানতে চেয়ে প্রায়ই চিঠি আসছে। বাবা ঠিক করেছে লালমণির হাটে যাবে। কিন্তু সেখানে কোথায় কার কাছে খোঁজ করবে, সেটাও একটা সমস্যা।

হাতি নিয়ে আসা লোকটার নাম গোপাল ঘোষ, শোভা সেটা জেনেছে এইমাত্র। সে এসেছে শুনে বাবাকে খুশি হতেই দেখেছে শোভা। গামছা কাঁধে কুয়োর পাড়ে যেতে যেতে বলেছে, 'যাক! একটু খোশগল্প করা যাবে। হাতি কিনেছে নাকি গোপলা?'

গোপাল ঘোষের সামনে এখন চা আর মিষ্টি। খুদিদা চা খেতে ভালবাসেন— এটা গোপাল ঘোষ ভালমতোই জানেন। সামনে চা ভরতি পেয়ালা থেকে ফুরফুরে সুবাস বেরচ্ছে টের পেয়ে তিনি ভাবছিলেন চায়ের নাম জেনে নিতে হবে। হাতির পিঠে কিংবা বজরায় চেপে এমন সুগন্ধি চা খেতে খেতে যাওয়াটা বেশ ভালই হবে। এটা ভেবেই চায়ে জমিয়ে একটা চুমুক দিলেন। শরীর আর মনে বেশ আমেজ চলে এল তাঁর। তিনি চোখ বন্ধ করে তৃপ্তির স্বরে বললেন, 'আঃ।' তারপর আরেকটা চুমুক দিয়ে ক্ষোভের স্বরে বললেন, 'বললেই হল জমিদারদের পছন্দ করি না। ইংরেজের রাজত্বে ওই বস্তুমূলক দ্বন্দ্ব আইন মোটেই পাশ হবে না।'

স্নান সেরে খুদিদা তখনই চলে এল। গোপাল ঘোষের শেষ কথাগুলো শুনেছিলেন তিনি। তাই বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'বস্তুমূলক না হে! দ্বন্দ্বমূলক। তা এসব তোমার কানেও গিয়েছে নাকি ভায়া?'

তারপর মুখোমুখি আরামকেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, 'হাতি কিনে ফেললে নাকি? শুনেছিলাম কী নাকি একখানা ক্যামেরা কিনেছিলে?'

গোপাল ঘোষ হাতি বা ক্যামেরার প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'কী সব শুনছি? মার্কস সাহেবের পার্টি নাকি জমিদারদের লাইক করে না?'

'ওইরকমই ব্যাপার। টাউনে তো ওদের একটু-আধটু সাপোর্টার তৈরি হচ্ছে। আমার ধারণা ওরা গান্ধিজির সঙ্গে মিলেমিশেই কাজ করবে। তা হাতি কিনলে কবে?'

গোপাল ঘোষ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'কাল ডেলিভারি পেয়েছি দাদা। এই পয়লা বোশেখে একটা বজরাও নিচ্ছি। প্রথম দিন কিন্তু ওটায় আপনাকে চড়তেই হবে!'

'বজরা?'

'রায়বাহাদুর খেতাব তো আর পাব না। লোকে যদি জমিদার বলে মানে, তাই হাতি আর বজরা নিচ্ছি।'

গোপাল ঘোষের বলার ধরনে ভারী আমোদ পেয়ে হো হো করে হেসে ফেললেন খুদিদা।

আজকের সবুজ থেকে ধূসর হয়ে আসা শহরের দূষণমুখর রাস্তায় চলতে চলতে সেই হাসি শোনাল যেন ডুয়ার্সের হরিদ্রাভ আত্মা। ঘোর শ্রাবণের বৃষ্টিবিরল নিদাঘ দিনে হাঁসফাঁস করতে করতে আমি তাঁর দিকে তাকাই। তিনি স্মিত হেসে বলেন, 'কেমন বুঝছ হে ছোকরা?'

'উপেন কোথায় গেল?'

'এত তাড়াহুড়ো কেন?'

কেবল এ কথাটাই বললেন তিনি। তারপর মিলিয়ে গেলেন নিস্পন্দ, উষ্ণ বাতাসে। আবার পিছিয়ে যেতে লাগল সময়। মুছে যেতে লাগল দালান, বিজ্ঞাপনের আলোকময় বোর্ড, বিদ্যুতের খুঁটি, হ্যালোজেন, এলইডি'র আলো, মোবাইলের রিং। প্রযুক্তির চিহ্নগুলি মুছে গিয়ে ফুটে উঠতে শুরু করল কাঁচা আর কিছু পাকা রাস্তায় ভরা, গাছগাছালির ফাঁকে টিনের ঢালু চালের বাড়িঘর শোভিত এক সুসজ্জিত ছোট্ট টাউন। গোরু আর ঘোড়ার গাড়ি, কিছু সাইকেল, কিছু মোটরগাড়ি, দুলকি চালে যাওয়া হাতি, ছিমছাম চায়ের দোকান, আর কিছু লাল ইটের দালানে সাজানো একটা শহর। সেই শহরের এক পাড়ায় গল্পে মত্ত গোপাল ঘোষ।

**শুভ্র চট্টোপাধ্যায়**

(চলবে)

Green Tea Resort

Batabari (Near of Batabari Tea Garden,
Murti More) Jalpaiguri, Dooars
Resort Contact no. : +91 98749 26156

Kolkata Office - 112, Kalicharan Ghosh Road, Near Baishakhi Sweets, Kolkata- 700050
Kolkata Cont.no - +91 98310 64916, +91 92316 77783
e-mail : greentearesort@gmail.com

# বসন্তপথ

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য

(**আগে যা ঘটেছে :** তিথি এই প্রজন্মের মেয়ে হয়েও তার বন্ধুদের মতো কেবলমাত্র কেরিয়ার গড়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় বিভোর নয়। তিথি সুমনকে ভালবাসে। তাই নিজের পরিচিত অভ্যস্ত নিরাপদ পরিবেশ, সমস্ত জাগতিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আর্তি অবহেলায় তুচ্ছ করে তিথি এগিয়ে এসে হাত ধরে তার ভালবাসার মানুষটির। ডুয়ার্সের এক প্রত্যন্ত গ্রাম পাতাঝোরায় শুরু হয় তাদের যৌথ জীবন। এদিকে উৎপলেন্দু-মিমি কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজি নন সুমনকে। মেনে নিতে রাজি নন তিথির মামা দীপকও। দীপকের স্ত্রী তুলি পারিবারিক চাপে অসহায়। হেডমাস্টার মধুসূদন পাতাঝোরাকে অন্তর থেকে ভালবাসেন। তাঁর সঙ্গে ভাব হয় তিথি-সুমনের। পঞ্চায়েতপ্রধান ইয়াসিন সুমনকে তাদের রাজনৈতিক দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দিলে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে সুমন। ভোররাতে সাপের স্বপ্ন দেখে চমকে ওঠে তিথি। দিল্লি থেকে আসা বিমলেন্দু চান সুমন-তিথির কাছে গিয়ে সব মিটমাট করে নিতে। রাজি হন না উৎপলেন্দু। তিথির বন্ধুরা প্ল্যান করে পাতাঝোরা গিয়ে তিথিকে চমকে দেবার। সন্ধেবেলা রান্নাঘরে যায় তিথি। উৎপলেন্দু সকালে সুমনের ফোন পান, তিথি আর নেই। মিমি অজ্ঞান হয়ে যান। নার্সিং হোমে ভরতি করা হয় মিমিকে। শ্যালক দীপক আর তুলিকে মিমির দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে উৎপলেন্দু রওনা হন পাতাঝোরার উদ্দেশে। সাদা কাপড়ে ঢাকা তিথির শব দেখে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন উৎপলেন্দু। সুমনদের সঙ্গে তিনিও শ্মশানে যান একমাত্র মেয়েকে দাহ করতে। তারপর...)

৩২

রোগাটে গড়নের হনু বার করা নিবারণ চক্রবর্তীর চালচলনে একটা মুরুব্বি ভাব। দু'চোখে প্রবল বিরাগ নিয়ে লোকটিকে জরিপ করছিলেন উৎপলেন্দু। কিছু কিছু লোক বোধ হয় এমন থাকে। কিছু জানে না বলেই সবজান্তা একটা ভাব করে। যোগমায়া চা এনে দিয়েছেন। শব্দ করে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন পুরোহিত নিবারণ চক্রবর্তী। কেজো গলায় বললেন, কুশ, প্যাঁকাটি, তেল, ঘি, মধু, অগুরু— যেমন যেমন বলেছিলাম, সব আনা হয়েছে তো?

কথা হচ্ছে বাড়ির উঠোনে বসে। মোড়ায় বসে রয়েছেন নিবারণ। সামনে রয়েছেন যোগমায়া আর উৎপলেন্দু, সুমন। দু'চারজন মহিলা এসেছেন আশপাশের বাড়ি থেকে। একটি বছর পাঁচেকের শিশুও আছে সেই দলে। সকলে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে নিবারণের কথা। শিশুটি শুধু এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।

যোগমায়া সাদা একটা শাড়ি পরে রয়েছেন। হাতে একটা ফর্দ নিয়ে শশব্যস্ত হয়ে বললেন, ঠাকুরমশাই, আপনি যা যা লিস্ট

যতই শোকতাপ থাক, ক্লান্ত শরীর সেসব বুঝতে চায় না। সে জৈবিক নিয়মেই একটু বিশ্রাম চায়। সাধুসন্ন্যাসীরা হয়ত শরীরের বাইরে মনটাকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ। এই চরম শোকের সময়েও নিজের শরীরের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলতে পারি না।

দিয়েছিলেন, সবই আনা হয়েছে। তবুও একবার দেখে নিন কিছু বাকি পড়ল কি না।

চা-বিস্কুট খেয়ে চায়ের কাপটা মাটিতে রাখলেন নিবারণ। লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, কাজের সময় সাদা ফুল লাগবে কিন্তু অনেক।

যোগমায়া ঘাড় নাড়লেন, আশপাশের সবাইকে বলা আছে। ফুলের অভাব হবে না।

নিবারণ জানতে চাইলেন, আচ্ছা একটা কথা বলি, কত লোক নেমন্তন্ন করা হয়েছে?

যোগমায়া বললেন, বেশি নয়, হাতে গোনা কিছু আত্মীয়স্বজন আর পাড়াপ্রতিবেশী। মানে যেটুকু না করলেই নয়। এ তো আর আনন্দের কোনও অনুষ্ঠান নয়।

নিবারণ সায় দিলেন, বটেই তো। তারপর যোগমায়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তিথি মায়ের ছবি করানো হয়ে গিয়েছে তো?

যোগমায়া বললেন, হ্যাঁ, সুমন আলিপুরদুয়ার থেকে ওর এক বন্ধুকে দিয়ে তিথির একটা ছবি বাঁধিয়ে নিয়ে এসেছে।

নিবারণ উঠতে উঠতে বললেন, ঠিক আছে, তাহলে ওই কথাই রইল। আমি কাল সকাল সকাল চলে আসব। আপনারা সব জোগাড়যন্ত্র করে রাখবেন।

মুখের মধ্যে কেমন একটা বিস্বাদ ভাব, গলা দিয়ে টক জল উঠে আসছিল, গা গোলাচ্ছিল ভীষণ। সেটাই স্বাভাবিক। বাবা হয়ে মেয়ের শ্রাদ্ধকার্য নিয়ে আলোচনা শোনার মতো মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। প্রবল বিবমিষা বোধ করছিলেন উৎপলেন্দু। নিজের মেয়ের শ্রাদ্ধকার্য নিয়ে আলোচনা শুনে গা গুলাচ্ছিল।

উৎপলেন্দু ঘরে ফিরে এসেছেন। কাঠের আলমারিটার মধ্যে থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে বিছানায় আধশোয়া হলেন। পড়া আর হয়নি। কালো কালো অক্ষরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখন যে চোখ লেগে এসেছে কে জানে।

তন্দ্রা ভাঙল কার যেন গলার আওয়াজে। সুমন বলল, অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে, ছি ছি, আপনার দুপুরের খাওয়ার বড্ড দেরি হয়ে গেল আজ। একটু কিছু মুখে দেবেন চলুন।

উৎপলেন্দু বললেন, আমার জন্য চিন্তা কোরো না। তা ছাড়া দেরি কিছু হয়নি। শোকের বাড়িতে সব কি আর নিয়মমতো হয়?

যোগমায়া কুণ্ঠিতভাবে বললেন, খুব সামান্য আয়োজন। ঢেঁকি-ছাঁটা চালের ভাত, সঙ্গে মসুর ডাল, আলু ভাজা আর সয়াবিনের ঝোল। আপনার যে খুব অসুবিধা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পারছি দাদা।

উৎপলেন্দু বললেন, আপনার রান্নার হাত বেশ ভাল। তবে ঝাল একটু বেশি।

যোগমায়া হাসলেন, সুমনের বাবাও এই কথা বলতেন। আসলে আমাদের আদি বাড়ি ময়মনসিংহ। সেখানকার লোকেরা শুনেছি রান্নায় খুব ঝাল দেয়।

উৎপলেন্দু উৎসাহ নিয়ে বললেন, আপনারা ময়মনসিংহের লোক? আমাদের দেশের বাড়ি অবশ্য নারায়ণগঞ্জে। আমাদের রান্নার সুনাম রসিকজন জানেন।

তৃপ্তি করে খেলেন উৎপলেন্দু। হাত ধুয়ে এলেন। হাত মুছলেন গামছা দিয়ে।

যোগমায়া বললেন, এবার একটু শুয়ে নিন। কাল রাত জাগা গিয়েছে, আপনার মুখ-চোখ দেখেই বুঝছি আজ আর দিচ্ছে না আপনার শরীর।

উৎপলেন্দু বললেন, আসলে যতই শোকতাপ থাক, ক্লান্ত শরীর সেসব বুঝতে চায় না। সে জৈবিক নিয়মেই একটু বিশ্রাম চায়। সাধুসন্ন্যাসীরা হয়ত শরীরের বাইরে মনটাকে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু আমরা তো সাধারণ মানুষ। এই চরম শোকের সময়েও নিজের শরীরের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভুলতে পারি না।

উৎপলেন্দু বিছানায় একটু শুলেন। দেখতে দেখতে জড়িয়ে এল চোখ।

ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়লেন উৎপলেন্দু। সুমন একটা চেয়ারে বসে ছিল। উদ্বিগ্ন মুখে জানতে চাইল, শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

উৎপলেন্দু বললেন, একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম ঘুমের মধ্যে। বিরাট একটা মাঠে মেলা বসেছে। আলো জ্বলছে প্রচুর, নাগরদোলা ঘুরছে। মাইক বাজছে তারস্বরে। চুড়ির দোকানের সামনে অনেক লোক। পাশে আচারের দোকান। তার উলটো দিকে বন্দুক নিয়ে বেলুন ফাটাবার ব্যবস্থা। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আমার শ্যালক দীপক এক চোখ বুজে নিশানা করছে সামনের দিকে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, উৎপলদা, টিপ করুন। দেখি, কে বুল'স আই হিট করতে পারে!

সুমন কৌতূহলী গলায় বলল, তারপর?

উৎপলেন্দু একটু অন্যমনস্ক যেন। বললেন, আমি সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে গেলাম। বেলুন নয়, বিরাট একটা গোখরো সাপ ফণা উঁচু করে দোলাচ্ছে। দীপকের হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে গুলি ছুড়লাম একটা। সেটা গিয়ে বিঁধল সাপটার ফণার ঠিক মাঝখানে। পরপর অনেকগুলো গুলি চালালাম। ম্যাগাজিন পুরো খালি করে দিয়ে বুঝি শান্তি। এক দমে কথা শেষ করে উৎপলেন্দু শ্বাস নিচ্ছেন জোরে জোরে।

সুমন দেখছিল উৎপলেন্দুকে। বিস্ফারিত মুখ-চোখ, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছেন উৎপলেন্দু। হাঁপাতে হাঁপাতেই বললেন, এক-একবার গুলি গিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে সাপটার ফণা আর অজস্র রক্তের বিন্দু ছিটকে গিয়ে লাগছে পেছনের সাদা পর্দাটায়। কী ভয়ংকর সেই দৃশ্য তোমাকে কী করে বোঝাব! কিন্তু এটাও ঠিক, সাপটা আমার গুলি খেয়ে যত এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাচ্ছিল, আমার কেমন একটা বুনো আনন্দ হচ্ছিল।

বিছানার পাশের টেবিলটায় এক কাপ চা ঢাকা দিয়ে রাখা। সুমন চায়ের কাপের উপর থেকে প্লেটটা তুলে উৎপলেন্দুর দিকে বাড়িয়ে দিল। শান্ত গলায় বলল, নিন, চা খেয়ে নিন। এখনও গরম আছে।

উৎপলেন্দু বললেন, ভাল কথা, সকালে ন্যাদন নামের ছেলেটা এসে যেটা ধরেছিল, সেই গোখরো সাপটা কোথায়?

সুমন বলল, এখানে একটা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে। ওরা দুপুরের দিকে এসে সাপটাকে নিয়ে গিয়েছে।

উৎপলেন্দু বিস্মিত হয়ে বললেন, সাপটাকে নিয়ে গিয়েছে? কেন?

সুমন বুঝিয়ে বলল, ন্যাদন সাপটাকে ধরার সময় দেখেছি ওটার চোখে চোট লেগেছিল। তাই আমিই ওদের খবর দিয়েছিলাম।

উৎপলেন্দু বললেন, সাপটাকে নিয়ে কী করবে ওরা?

সুমন বলল, ওদের মধ্যে একজন ডাক্তার ছিলেন। উনি বললেন, স্পেকটাকুলাম প্রজাতির এই সাপটার বয়স সাত বছরের মতো। পশ্চিমবঙ্গ আর অসমের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় এই প্রজাতির গোখরো। সাপটার চোখে ভাইরাল অপথ্যালমিয়া নামে একটি রোগ হয়েছে।

উৎপলেন্দু হাঁ করে সুমনকে দেখতে দেখতে বললেন, চোখের রোগ হয়েছে? ওই সাপটার?

সুমন সায় দিয়ে বলল, ভাইরাসঘটিত রোগের জন্যই সাপটার একটা চোখ মুক্তোর

মতো হয়ে গিয়েছে। সে জন্য চোখে স্টেরয়েড আর অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে ক'দিন।

উৎপলেন্দু চায়ের কাপে চুমুক দিলেন একটা। বললেন, যাক গে, নিয়ে গিয়েছে যাক। কিন্তু সারিয়ে-টারিয়ে ফেরত দিয়ে যাবে তো?

সুমন বলল, ফেরত দেবে কেন? গোখরোটাকে সারিয়ে তুলে ওরা জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসবে।

উৎপলেন্দু রীতিমতো অবাক হয়েছেন। হাঁ করে সুমনকে দেখতে দেখতে বললেন, সাপটাকে হাতে পেয়েও তুমি ছেড়ে দেবে সুমন? ওটাকে পিষে মারবে না?

সুমন মলিন হাসল, কী লাভ! তিথিকে তো আর ফেরত পাব না। তা ছাড়া সাপটা নিজে অনেকদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে রয়েছে। সে দিনও নিজের গর্তে বিশ্রাম নিচ্ছিল। একটু বিষ্টির জল পেয়ে উপরে উঠেছিল। সে সময় তিথির পা পড়েছিল ওর লেজে। তখন সম্ভবত আক্রান্ত হবার ভয়েই কামড়েছিল তিথিকে।

উৎপলেন্দু পূর্ণ দৃষ্টিতে সুমনের দিকে তাকালেন। এতদিন ধরে একদিক থেকে আলো পড়ছিল, ভাল করে তাকে চিনতে পারেননি। এবার অন্য দিক থেকে আলো এসে পড়ে তাঁর চোখ খুলে দিল। হীরের টুকরোটিকে চিনে নিতে ভুল হল না তাঁর।

## ৩৩

ইয়াসিন এক বিকেলের দিকে মোটর সাইকেল চালিয়ে পিলয়নে বসিয়ে নিয়ে এসেছে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সি এক ভদ্রলোককে। এক মাথা কাঁচাপাকা চুল, গালে দু'দিনের দাড়ি, দোহারা গড়নের চেহারা, চশমার আড়ালে বুদ্ধিদীপ্ত দুটো চোখ।

ইয়াসিন পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, ইনি সৌমেন রক্ষিত, কলকাতায় থাকেন। আমাদের রাজ্য স্তরের নেতা। তোমার সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে এসেছেন।

সুমন জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করে বলল, বসুন।

উৎপলেন্দু বসে আছেন অন্য একটি চেয়ারে। ইয়াসিনের দিকে তাকিয়ে গলায় চাপা বিরক্তি মিশিয়ে বললেন, অনধিকার চর্চার জন্য দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, সুমন এখন মানসিকভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। পার্টি পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করার মতো মনের অবস্থা এখন ওর থাকার কথা নয়।

ইয়াসিন বিব্রত মুখে বলল, পার্টি পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা করার জন্য সুমনের কাছে আসিনি দাদা। সুমনের কথা আমি জেলা নেতৃত্বের কাছে বলেছিলাম। ওরা সকলে সুমনকে দলে যোগ দেওয়াবার জন্য আমাকে বলেছে। কিন্তু সুমন রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চায় বলে ওকে আমি আর জোর করিনি।

ইয়াসিন বলল, সৌমেনদা জলপাইগুড়ি এসেছিলেন পার্টির কিছু কাজে। আলিপুরদুয়ার এসেছিলেন আজ সকালে। সেখান থেকে পাতাঝোরায় এসেছেন শুধু সুমনের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

সুমন একটা শ্বাস ছাড়ল। বলল, বলুন কী বলবেন।

সৌমেন রক্ষিত সরাসরি মূল প্রসঙ্গে চলে গিয়ে বললেন, আমি কলকাতায় থাকলেও এদিকের সব খবর রাখার চেষ্টা করি। আমি ইয়াসিনের মুখে শুনেছি যে পেনশনভিত্তিক জমি অধিগ্রহণ কীভাবে এই রাজ্যের জন্য আদর্শ হতে পারে— এই বিষয়টা নিয়ে পাতাঝোরা গ্রামের চাষিদের নিয়ে একটা আলোচনাসভা করা হয়েছিল। আপনি সে দিনের সভায় যা যা প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে আমাদের দল বিস্তারিত আলোচনা করেছে। শুনলে খুশি হবেন যে, আপনার ভাবনা আমাদের রাজ্য নেতৃত্বকে গভীরভাবে ভাবিয়েছে।

সুমন হাসবার চেষ্টা করে বলল, ধন্যবাদ।

সৌমেন নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলেন। বললেন, জমি অধিগ্রহণ নিয়ে সারা দেশে কীরকম তুলকালাম চলছে, আপনি তো নিশ্চয়ই তার খোঁজ রাখেন।

সুমন বলল, খবরের কাগজ পড়ে যেটুকু খোঁজ রাখা সম্ভব, সেটুকু রাখি।

সৌমেন বললেন, আগের সরকারকে সরিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতায় এসে নতুন সরকার চেয়েছিল শিল্প করিডর, আবাসন, প্রতিরক্ষা কারখানা পত্তন ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে, গ্রামীণ ও সামাজিক পরিকাঠামো নির্মাণে কিংবা সরকারি-বেসরকারি যৌথ প্রকল্পের জন্য সরকার সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে।

সুমন বলল, জানি। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান হল, সে জন্য কৃষকের সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই। জমি অধিগ্রহণের প্রভাবে প্রান্তিক চাষি বা অন্য আর কারও জীবিকায় টান পড়ল কি না, সেটা সমীক্ষা করে দেখার দরকার নেই।

সৌমেন সায় দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তখন সবগুলো বিরোধী রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের তুমুল বিরোধিতা জানিয়েছিল। কারণ, তাদের মতে এটা একটা চরম অবস্থান। এতে কৃষকদের বঞ্চনা করা হবে। এদিকে আমাদের রাজ্যের অবস্থান হল, জোর করে কৃষকের এক ছটাক জমিও নেওয়া হবে না।

সুমন শুকনো হাসল, সেটাও সম্ভবত একরকম চরম অবস্থান।

সৌমেন বললেন, সেটা আপনার মত হতে পারে, আমার ব্যক্তিগতভাবে তা মনে হয় না। তবুও তর্কের খাতিরে যদি সেটা ধরেই নিই, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে— এই দুই চরম অবস্থানের মধ্যে বিকল্প কোনও প্রস্তাব কি হতে পারে? কী ভাবছেন আপনি?

সুমন একটু ভাবল। তারপর বলল, আপনি হয়তো জানেন যে, জমি আইন সংশোধন করা নিয়ে সারা দেশ উথালপাথাল, তখন কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এক নতুন মডেল নিয়েছে। বিজয়ওয়াড়া আর গুন্টুরের মাঝে নতুন রাজধানী নগর 'অমরাবতী' গড়ে তুলছেন ওখানকার সরকার। আমাদের রাজ্যেও আমরা সেই মডেল অনুসরণ করতে পারি।

সৌমেন নড়েচড়ে বসে বললেন, কী সেই মডেল?

সুমন বলল, কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমি দিন। নতুন যে রাজধানী শহরের পত্তন হবে, জমির মালিক তথা কৃষককে সেই উন্নয়নের অংশীদার করা হবে। উন্নয়নের পর রাজধানী শহরের বহুমূল্য জমির একটা অংশ মূল মালিকরা বাসস্থান ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ফিরে পাবেন। ততদিন সরকার প্রতি বছর অ্যানুইটি দেবে জমির মালিককে।

সৌমেন বুকপকেট থেকে একটা কাগজ আর পেন বার করেছেন। আঁকিবুকি করে নোট নিলেন দ্রুত। কেজো গলায় বললেন, সেই অ্যানুইটি চলবে কতদিন ধরে?

সুমন বলল, পরবর্তী দশ বছর ধরে। যে জমি দোফসলি, তার মালিক এক একর জমি দিলে শহর পত্তনের পর বাসস্থানের জন্য অনেকটা জমি পাবেন। সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য আরও বেশ খানিকটা জমি

কৃষকরা স্বেচ্ছায় জমি দিন। নতুন যে রাজধানী শহরের পত্তন হবে, জমির মালিক তথা কৃষককে সেই উন্নয়নের অংশীদার করা হবে। উন্নয়নের পর রাজধানী শহরের বহুমূল্য জমির একটা অংশ মূল মালিকরা বাসস্থান ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ফিরে পাবেন। ততদিন সরকার প্রতি বছর অ্যানুইটি দেবে জমির মালিককে।

পাবেন। বছরে তিরিশ হাজার টাকা করে দশ বছর ধরে অ্যানুইটি দেওয়া হবে তাঁকে। প্রতি বছর সেই অ্যানুইটি বাড়বে দশ শতাংশ হারে।

সৌমেন বললেন, বেশ। কিন্তু জমি তিন ফসলি হলে?

সুমন বলল, তাহলে কৃষকের সুবিধা আরও বেশি হবে। এক একর জমি দান করলে রাজধানী পত্তনের পর বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য আরও বেশি জমি পাবেন। সে ক্ষেত্রে অ্যানুইটি পাওয়া যাবে বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে। তা ছাড়াও কৃষকদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মকুব করা যায়। সেই সঙ্গে প্রান্তিক চাষি এবং জমির উপর নির্ভরশীল ভূমিহীনদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা ভাতা দেওয়া যেতে পারে। কৃষক পরিবারের পরের প্রজন্ম যাতে বিকল্প পেশা বেছে নিতে পারে, তার জন্য একটা স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার গড়ে তোলা যায়।

উৎপলেন্দু তারিফ করে বললেন, খুব ভাল প্রোপোজাল। সরকার জোর করে জমি নিচ্ছে না, আবার কৃষকদের স্বেচ্ছায় দেওয়া জমি থেকে একটা জমি ব্যাঙ্ক তৈরি করছে।

সৌমেন বললেন, আমাদের রাজ্য সরকারও কিন্তু অনেকটা এইরকম একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু তা এভাবে নয়। সরকারের মালিকানায় থাকা জমি নিয়ে ওই ব্যাঙ্ক গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল আমাদের রাজ্য।

সুমন হাসল, শিল্প বা পরিকাঠামো নির্মাণের মতো প্রকল্পে কৃষকরা যাতে স্বেচ্ছায় জমি দেন, সে জন্য কোনও প্রস্তাব কিন্তু রাজ্য সরকার দেয়নি।

সৌমেন বললেন, বহুফসলি জমি পারতপক্ষে নেওয়া ঠিক নয়। তার কারণ খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টি এর সঙ্গে জড়িত।

সুমন হাসল, কিন্তু একেবারেই তা নেওয়া যাবে না এমন মতকেও সমর্থন করা যায় না। তা ছাড়া কৃষকরা যখন স্বেচ্ছায় জমি দিচ্ছেন, তার অর্থ হল, তাঁরাও চান যে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম অন্য পেশা বা জীবিকা বেছে নিক।

ইয়াসিন বলল, কৃষকদের এভাবে উন্নয়নের অংশীদার করে নেওয়ার এই প্রস্তাব ভেবে দেখার মতো। এর ফলে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন যেমন হবে, তেমন তাদের বঞ্চিত হবার আশঙ্কাও থাকবে না।

সৌমেন চিন্তিত স্বরে বললেন, কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে জমির মালিকানা খুবই ছোট ছোট অংশে বিভক্ত, সেখানে এই মডেল কাজ করবে কি না। তাই জমি অধিগ্রহণে সরকারের কিছুটা ভূমিকা থাকা উচিত।

সুমন বলল, কৃষকরা এখন আগের থেকে অনেক বেশি সচেতন। তাঁরা দেখে নিতে চান, জমি দিলে পরিবর্তে কী পাবেন। সিঙ্গুরে বা পসকোর ক্ষেত্রে এই একই ফর্মুলা প্রয়োগ করলে হয়তো এমন চরম অসন্তোষ হত না।

ইয়াসিন বলল, তবে কেন্দ্র যেহেতু এখন রাজ্যগুলির উপরে জমিনীতি স্থির করার দায়িত্ব দিতে চাইছে, তাই এই পথ ভাল না মন্দ তা বাকি রাজ্যগুলিরও বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে। আমরাও উদ্বিগ্ন বিষয়টা নিয়ে।

পেন পকেটে গুঁজে উঠে পড়লেন সৌমেন। সুমনের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আপনি অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত একজন মানুষ। আমি ইয়াসিনের মুখে শুনেছি আপনার চরম ক্ষতির কথা। তবুও নির্লজ্জের মতো আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী।

সুমন বলল, না না, ঠিক আছে।

সৌমেন স্মিতমুখে বললেন, কিন্তু এটাও ঠিক, পাতাঝোরায় এসে আমি একদিক দিয়ে ভালই করেছি। এখানে না এলে, আপনার সঙ্গে কথা না বললে আমার অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। এই আমার কার্ড, এটা রেখে দিন। আমার ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা আছে এখানে। যে কোনও প্রয়োজনে যখন খুশি ফোন করবেন।

সৌমেন রক্ষিতকে পিলিয়নে বসিয়ে মোটর সাইকেলের সাইলেন্সার পাইপ থেকে গলগল করে কালো ধোঁয়া চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে ভটভট শব্দ তুলে চলে গেল ইয়াসিন।

## ৩৪

সুমন যে প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়, তার হেডমাস্টার মধুসূদন এসেছেন। পরিচয় হয়েছে উৎপলেন্দুর সঙ্গে। উৎপলেন্দুর ভাল লেগেছে মানুষটাকে। মধুসূদনের ময়নাগুড়িতে নিজের বাড়ি, কিন্তু পাতাঝোরাতে থাকতে থাকতে জায়গাটাকে ভালবেসে ফেলেছেন মধুসূদন। একটু আগে উৎপলেন্দুকে বুঝিয়ে বলছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে কোচ-রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক কতটা নিবিড়। আরণ্যক জীবন থেকে আধুনিক কৃষি সভ্যতায় উত্তরণের ধারাবাহিক চিহ্নগুলি লোকায়ত কৃষ্টি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য মনন, দর্শনের মধ্যেই স্পষ্ট হয়।

উৎপলেন্দু বললেন, পাতাঝোরায় এসে আমার সত্যিই বিস্ময় বাড়ছে। এমন গ্রামের কথা কখনও শুনিনি। স্বর্গ থেকে খসে পড়া একটা টুকরো যেন এই পাতাঝোরা গ্রাম। আমার হুইটম্যানের সেই 'সং অব মাইসেল্‌ফ' কবিতাটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

সুমন মৃদু গলায় বলল, সেই পঙ্‌ক্তিটা তিথির খুব প্রিয় ছিল। সেই যে এক শিশু প্রশ্ন করল, ঘাস কী জিনিস? আমার সামনে তার হাতের মুঠো মেলে ধরল, এক মুঠো ঘাস। শিশুকে আমি কী উত্তর দেব! আমি তার চাইতে বেশি কিছু কি জানি? হতে পারে সবুজ আশা দিয়ে বোজা আমার প্রকৃতির পতাকা। হতে পারে, এ হল আমার প্রভুর রুমাল। গন্ধ মাখা একটি দান, একটি স্মারক ইচ্ছে করে ফেলে দেওয়া। এক কোণে তাঁর নামটি লেখা, যাতে আমরা দেখতে পাই, বলতে পারি এ কার রুমাল? হতে পারে, প্রতিটি ঘাসের ফলা হল এক-একটি শিশু, শষ্পের শাবক।

উৎপলেন্দু বিস্মিত স্বরে বললেন, তোমার হুইটম্যান মুখস্থ!

সুমন মৃদু হাসল, হুইটম্যান তো আর শুধু আমেরিকার প্রিয় কবি নন, তিনি আমাদের মতো অনেকেরই পছন্দের কবি। তাঁর দেখার দৃষ্টি, তাঁর ঈশ্বরচিন্তা আমাদের ভাবায়।

উৎপলেন্দু একটু যেন অন্যমনস্ক। বললেন, তিথি কবিতা পড়তে ভালবাসত। বাংলা, ইংরেজি সব ধরনের কবিতা।

মধুসূদন একটুক্ষণ থমকে থেকে বললেন, হ্যাঁ। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে সামান্য কিছু উপন্যাস-গল্প-কবিতা-প্রবন্ধের বই আছে। তিথি আমার কাছ থেকে সুনীলের কবিতার বই নিয়ে এসেছিল একবার।

সুমন বলল, সুনীল ওর প্রিয় কবিদের একজন। আমি সুনীলের লাইন ধার করে বলতাম, ভ্রূপল্লবে ডাক দিলে দেখা হবে চন্দনের বনে। তখন তিথি হেসে হেসে বলত, ভুবন পেরিয়ে এই হিম সন্ধেবেলা, শুধু কবিতার জন্য কি আসা যাবে? শুধু ভালবাসার জন্য কি হেঁটে যাওয়া যাবে আগুনের ওপর দিয়ে? প্রতিদিন মরে যেতে যেতেও অমরত্বকে তাচ্ছিল্য করা যাবে কি?

উৎপলেন্দু মৃদু গলায় বললেন, কবি হয়ত পেরেছিলেন। তাঁর সে সময়টা হয়ত পেরেছিল। কিন্তু আজকের সময় বোধ হয় অন্য কোনও ম্যাজিকে বিশ্বাসী। তবে আমাদের চোখে এখন আর প্রকৃতি নেই। আছে ভোগ। মুরগি দেখে প্রভুর কথা আমাদের আর মনে পড়ে না। আমরা ভাবি রোস্টের কথা।

মধুসূদন উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। উরগ জাতকের একটা গল্প মনে পড়ল। আপনারা দু'জন নিজেদের খুব কাছের একজন মানুষকে হারিয়েছেন। এই গল্পের দর্শন আপনাদের মনের যন্ত্রণা একটু হলেও হয়ত লাঘব করবে।

উৎপলেন্দু বললেন, বলুন।

মধুসূদন বললেন, তথাগত বুদ্ধ তখন জেতবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় বারাণসীতে এক ভূস্বামীর পুত্রবিয়োগ হল। সন্তানবিয়োগ সেই ভূস্বামী শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। সেই ভূস্বামী তথাগতর অনুরাগী, তাই তাঁর পুত্রবিয়োগের সংবাদ এসে পৌঁছাল বুদ্ধদেবের কাছে। তিনি স্বয়ং ভূস্বামীর গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন বুদ্ধদেব সেই ভূস্বামীকে একটি কাহিনি শোনান।

উৎপলেন্দু একসঙ্গে বললেন, কী সেই কাহিনি?

মধুসূদন বললেন, কাশীতে তখন রাজা

ব্রহ্মদত্ত শাসন করছিলেন। তাঁর রাজধানীর কাছেই এক ব্রাহ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য করতেন। তাঁর ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রটির বিয়ে দিয়ে একটি সুন্দরী পুত্রবধূ ঘরে এনেছিলেন তিনি। এঁদের সঙ্গে বাস করতেন এক দাসী। এই পাঁচজনের সংসারে তিনিও ছিলেন একজন। দাসীসহ সংসারের প্রত্যেককে ব্রাহ্মণ উপদেশ দিতেন, তোমরা যখনই সুযোগ পাবে, তখনই দান করবে। শীল রক্ষা করে চলবে। উপবাস পালন করবে। সবসময় মনে রাখবে যে এই জীবন অনিত্য ও চঞ্চল। মরণই নিত্য। তাই মরণকে নিত্য জেনে সংসার পালন করতে চেষ্টা করবে।

সুমন কৌতূহলী স্বরে বলল, তারপর?

মধুসূদন বললেন, একদিন ব্রাহ্মণ খেতে লাঙল দিচ্ছেন আর তাঁর পুত্র সমস্ত কাঠকুটো জড়ো করে তাতে অগ্নিসংযোগ করছেন। খেতের পাশে ছিল এক উইয়ের ঢিপি। তাতে বাস করত এক কালসর্প। ব্রাহ্মণপুত্র আগুন জ্বালালে সেই আগুনের ধোঁয়া গিয়ে লাগল কালসর্পের চোখে। সাপ চোখের জ্বালায় অস্থির হয়ে ঢিপি থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চারটে বিষাক্ত দাঁত ফুটিয়ে দিল ব্রাহ্মণপুত্রের পায়ে।

সুমন আর উৎপলেন্দু মধুসূদনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সুমন বলল, তারপর কী হল?

মধুসূদন গল্পের খেই ধরে বললেন, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। এদিকে পুত্র ভূমিতে পড়ে আছে দেখে ব্রাহ্মণ তার কাছে উপস্থিত হলেন। সাপের দাঁতের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলেন যে সর্পদংশনে মৃত্যু হয়েছে তাঁর পুত্রের। কিন্তু চোখের সামনে এমন দৃশ্য দেখেও বিচলিত হলেন না সেই ব্রাহ্মণ। তাঁর চোখ দিয়ে এক ফোঁটাও অশ্রু নির্গত হল না। যার মৃত্যুর সময় হয়েছে, সে পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছে—এটাই এই জগতের নিয়ম। এই অনিত্যবুদ্ধিতে ব্রাহ্মণ এতটাই স্থির ছিলেন যে, তিনি আগের মতোই খেতে কাজ করতে লাগলেন।

উৎপলেন্দু নড়েচড়ে বসে বললেন, অদ্ভুত তো!

মধুসূদন বললেন, কিছুক্ষণ পর এক প্রতিবেশী খেতের পাশ দিয়ে কোনও কাজে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, তুমি কি বাড়ি যাচ্ছ? তাহলে ব্রাহ্মণীকে বলবে রোজ দুপুরে যে দু'জনের খাবার উনি পাঠান, তার আজ প্রয়োজন নেই। আজ একজনের খাবার আনলেই চলবে। আর আজ কেবল ব্রাহ্মণী একা নন, বাড়ির সকলেই যেন শুদ্ধ বস্ত্র পরে, ধূপদীপ ও পুষ্পহার নিয়ে এখানে আসেন। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণীকে এই সংবাদ পৌঁছে দিল।

সুমন বলল, তার মানে প্রতিবেশীর কথা থেকে ব্রাহ্মণী বুঝতে পারলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্র আর নেই?

মধুসূদন বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু পুত্রের মৃত্যুসংবাদ ইঙ্গিতে লাভ করেও ব্রাহ্মণীর চোখে-মুখে শোকের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না। তিনি শান্ত মনে একজনের প্রয়োজনীয় খাবার ও গন্ধপুষ্প হাতে অন্য চারজনের সঙ্গে চাষের খেতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণকন্যা বা মৃত পুত্রের বধূটির মুখ-চোখেও কোনও শোকজনিত বিকার দেখা গেল না। পরিবারের সকলে উপস্থিত হলে পুত্রের মৃতদেহের ছায়ায় বসে ব্রাহ্মণ ধীরচিত্তে আহার গ্রহণ করলেন। তারপর চিন্তা প্রজ্বলনের কাঠ সংগ্রহ করে এনে পুত্রের দেহে অগ্নি প্রজ্বলন করলেন।

উৎপলেন্দু বললেন, তারপর?

মধুসূদন বললেন, ব্রাহ্মণ পরিবারের এই অভিনব সাধনায় দেবরাজ বিস্মিত হয়ে ছদ্মবেশে মর্তে নেমে এলেন। চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এখানে কী করছ? উত্তরে ব্রাহ্মণ বললেন, একটি মানুষের সৎকার করছি। দেবরাজ জানতে চাইলেন, এই মৃতদেহ কি তোমাদের কোনও শত্রুর ছিল? তোমাদের চোখে এক ফোঁটা জল নেই কেন?

সুমন বলল, ব্রাহ্মণ কী বললেন?

মধুসূদন বললেন, ব্রাহ্মণ বললেন, এ আমার একমাত্র পুত্র আর্য। জীর্ণ ত্বক ত্যাগ করে সর্প যেমন নতুন ত্বক সৃষ্টি করে, ঠিক তেমনি মানুষ এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ লাভ করে। এতে শোকের তো কিছু নেই। শোক করলে কি মানুষ আর জীবিত হবে? এই কাহিনি বর্ণনা করে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মানবজীবন চঞ্চল। তাই প্রত্যেককে নিত্য মরণ-চিন্তা অভ্যাস করতে হবে।

একটুক্ষণ চুপচাপ সব। উৎপলেন্দু থেমে থেমে বললেন, রামকৃষ্ণদেবও মরণে হুঁশিয়ার থাকতে বলতেন সকলকে। জীব মাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। প্রতিদিন মৃত্যুচিন্তা করলে এই মায়াবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায় সহজে। জাতকের এই কাহিনি আগে শুনিনি। এই প্রথম শুনলাম।

সুমন মৃদু স্বরে বলল, তিথি আমাকে তানাবাতার গল্প শুনিয়েছিল।

উৎপলেন্দু বললেন, তানাবাতা?

সুমন বলল, প্রত্যেক বছর সপ্তম মাসের সপ্তম তারিখে জাপানে উদ্‌যাপিত হয় তানাবাতা উৎসব। এখন সারা বিশ্বের অনেক দেশেও সাতই জুলাই যাপিত হয় তানাবাতা ফেস্টিভ্যাল। সেখানেও একটা গল্প আছে।

মধুসূদন বললেন, কী সেই গল্প?

সুমন বলল, তানাবাতা হলেন স্বর্গের এক দেবী। তিনি মর্তলোকের এক কৃষকের পর্ণকুটিরের ক্ষণস্থায়ী অতিথি হয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন কৃষককে। কিন্তু একটা সময় তিনি কৃষককে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে ফিরে যান স্বর্গে। তানাবাতার সেই গল্পের সঙ্গে তিথির এই আকস্মিক চলে যাওয়ার মধ্যে কী অদ্ভুত মিল!

উৎপলেন্দু একটা শ্বাস ফেলে বললেন, জীবন যে অনিত্য, সেটা তো আমরা সকলেই জানি। চোখের সামনে প্রিয়জনের মৃত্যু তো আমাদের সারাজীবন ধরে দেখে যেতেই হয়। প্রত্যেকটা মানুষ তো জন্মায় মৃত্যুবীজ নিয়ে। কিন্তু মনকে আমরা সেটা বোঝাতে পারি কোথায়?

কথা বলতে বলতে সন্ধে গাঢ় হয়ে রাত নেমেছে পাতাঝোরায়। ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে মধুসূদন উঠে পড়লেন। বলে গেলেন কাল স্কুল থেকে সরাসরি এখানে চলে আসবেন। এর মধ্যে কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে সুমন যেন তাঁকে নির্দ্বিধায় জানায়।

রাতের খাবার আজ একটু তাড়াতাড়িই নিয়ে এলেন যোগমায়া। উৎপলেন্দুকে বললেন, এটুকু খেয়ে নিন দাদা। কাল সকাল সকাল উঠতে হবে আমাদের সবাইকে। নিবারণ চক্রবর্তী চলে আসবেন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

৩৫

রাতের আহার পর্ব মিটল। খেয়েদেয়ে এসে উৎপলেন্দু দেখলেন সুমন বিছানা করছে নিপুণ হাতে। পরিপাটি করে মশারি গুঁজে সুমন বলল, নিন, শুয়ে পড়ুন এবার।

উৎপলেন্দু বললেন, আজ রাতে আর ফ্যান চালাবার ভুলটা করব না। একটা পাতলা চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ব।

সুমন বলল, মাধবকাকুর ওষুধটা খাচ্ছেন তো মনে করে?

উৎপলেন্দু বললেন, ভদ্রলোক খুব ভাল ওষুধ দিয়েছেন। গলা ব্যথাটা অনেকটা কমে গিয়েছে।

এখন সারা বিশ্বের অনেক দেশেও সাতই জুলাই যাপিত হয় তানাবাতা ফেস্টিভ্যাল। তানাবাতা হলেন স্বর্গের এক দেবী। তিনি মর্তলোকের এক কৃষকের পর্ণকুটিরের ক্ষণস্থায়ী অতিথি হয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন কৃষককে। কিন্তু একটা সময় তিনি কৃষককে নিঃসঙ্গ করে দিয়ে ফিরে যান স্বর্গে।

সুমন হাসল, কাল দেখবেন পুরোপুরি কমে যাবে। মাধবকাকুকে এদিকের লোক ধন্বন্তরি বলে।

উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা সুমন, এই যে প্রত্যেক সেকেন্ডে কত কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে পৃথিবীতে, সেই প্রত্যেকটা কর্মকাণ্ডের মধ্যেই কি ঈশ্বরের কিছু না কিছু সংকেত রয়েছে বলে তোমার মনে হয়? এই যে ধরো তিথির মৃত্যুর মতো একটা ঘটনা, তোমার কি মনে হয় না তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর কোনও না কোনও একটা বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন তোমার কাছে বা আমার কাছে?

সুমন একটুক্ষণ ভাবল। বলল, আমার মনে হয় ঈশ্বর আমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে ফেলেন। দেখেন, চরম বিপদের দিনেও কে কতটা মানসিক কাঠিন্য দেখাতে পারে। দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যখন যেতে হয়, তখনই তো নিজের ভেতরের শক্তি আর দুর্বলতা আলাদা করে চিনে নিতে পারি আমরা। সকলেই তো আর নিজেকে অতিক্রম করে উঠতে পারে না। কেউ কেউ পারে।

উৎপলেন্দু বললেন, ইহস্বর্গভোগেষু ইচ্ছারাহিত্যম— এই কথাটা কখনও শুনেছ?

সুমন বলল, না শুনিনি।

উৎপলেন্দু বললেন, শংকরাচার্য গ্রন্থমালার অন্তর্গত ছোট্ট একটা বই হল 'তত্ত্ববোধ'। মোক্ষের সাধনভূত বৈরাগ্যের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে শংকর সেখানে স্পষ্ট বলেছেন, বৈরাগ্য বলতে বোঝায় ইহলৌকিক এবং স্বর্গীয় ভোগে অনিচ্ছা। যে ঠিক ঠিক মুক্তি চায়, সে পার্থিব ধনমান, গাড়ি-বাড়ি কোনও কিছুই চায় না। কারণ সে জানে, এ সমস্তই অনিত্য। তা ছাড়া বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদির ফল স্বর্গীয় ভোগেও তার অনীহা। কারণ, সেই ভোগও যে শান্ত। সে পেতে চায় নিত্যকে, শাশ্বতকে, সনাতনকে। একমাত্র ব্রহ্ম বা আত্মা ছাড়া নিত্যশাশ্বত সনাতন আর কিছুই থাকতে পারে না। তাই আত্মজ্ঞানেই মুক্তি। মুক্তির পথান্তর নেই।

সুমন দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ধীর পায়ে লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

উৎপলেন্দু এপাশ-ওপাশ করলেন অনেক রাত অবধি। ঘুম আসছিল না। শেষ রাতের দিকে চোখ জড়িয়ে এল একটু। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু স্বপ্ন দেখলেন। কিন্তু জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নগুলো আর মনে থাকল না। মিলিয়ে গেল আয়নায় লেগে থাকা জ্বলের দাগ যেভাবে মিলিয়ে যায়।

তন্দ্রা ভাঙল লোকজনের গলার স্বরে। মশারি সরিয়ে বিছানা থেকে নামলেন উৎপলেন্দু। চপ্পল পায়ে গলিয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠোনে এলেন।

গোবর দিয়ে নিকানো হয়েছে উঠোন। বড় একটা শতরঞ্চি পাতা হয়েছে পিছনে। একটা কাঠের চেয়ারের উপর তিথির একটা ছবি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। তিথির কপালে চন্দনের টিপ দিয়েছে কেউ। গলায় জুঁইয়ের মালা। দু'পাশে দুটো ফুলদানিতে রয়েছে শুভ্র রজনিগন্ধার গুচ্ছ। ধূপের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ব্যস্ত পায়ে ছোটাছুটি করছেন যোগমায়া।

বাথরুম থেকে ঘুরে এলেন একবার। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার থেকে ওয়ালেট নিয়ে বেরোলেন বাড়ি থেকে। রাস্তা চেনাই ছিল। গতকালের ফোন বুথে একবার এলেন। পিসিও'র ছেলেটা তাঁকে চিনে ফেলেছে। এক গাল হাসল। উৎপলেন্দুও হাসলেন।

দীপকের ফোন নম্বর ডায়াল করলেন উৎপলেন্দু। জিজ্ঞেস করলেন, ওদিকের খবর কী?

দীপক জানালেন, দিদি এখন অলমোস্ট নর্মাল। কাল-পরশু হয়তো রিলিজ করে দেবে।

উৎপলেন্দু বললেন, তিথির কথা কি আর জানতে চেয়েছিল মিমি?

দীপক বললেন, না, তিথির প্রসঙ্গ আর তোলেনি দিদি। কাউকে কিছু বলেওনি। তবু খুব মুষড়ে পড়েছে। আপনি কবে ফিরবেন জানতে চাইছিল। আমার মনে হচ্ছে তিথির ব্যাপারটা দিদি কিছু আন্দাজ করে নিয়েছে। হাজার হোক, মায়ের মন তো।

উৎপলেন্দু বললেন, আমি আজই সন্ধেবেলা চলে আসছি। তারপর দু'জনে মিলে খবরটা দেওয়া যাবে।

দীপক বললেন, তিথির বন্ধুদের গ্রুপটাকে আমি তিথির ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। আকাশ-নীল-দিয়া-অলিভিয়ারা আজ ভোরবেলা পাতাঝোরা রওনা দিয়েছে। তুলিও ওদের সঙ্গে যেতে চাইল। আমি বারণ করলাম না। ইন ফ্যাক্ট, আমারও খুব ইচ্ছে ছিল আসার। কিন্তু দিদি এখানে একা থাকবে ভেবে আর যেতে পারলাম না।

উৎপলেন্দু একটু অবাক হয়ে বললেন, তুলিরা আসছে এখানে?

দীপক বললেন, আমার সঙ্গে মোবাইলে কথা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ওরা দেখুন এতক্ষণে হয়ত পৌঁছে গিয়েছে পাতাঝোরায়।

হোমিয়োপ্যাথিক মাধবের চেম্বারে একবার ঢুঁ দিলেন উৎপলেন্দু। দু'জন রুগি ছিল। তারা ওষুধ নিয়ে চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করলেন। মাধব একটু ফাঁকা হলে বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এসেছি। আপনার ওষুধ খেয়ে আমার শরীর এখন অনেকটাই ভাল।

মাধব কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলেন উৎপলেন্দুর দিকে। কালো ফ্রেমের চশমার আড়ালে স্থির দুটো চোখ। উৎপলেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, যদি কিছু না মনে করেন, তবে একটা কথা বলব?

উৎপলেন্দু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন না।

মাধব বললেন, সামাজিক মানমর্যাদার দিক দিয়ে সুমন হয়তো আপনাদের যোগ্য নয়। আপনি বড় চাকুরে, সুমন সাধারণ একজন প্রাইমারি স্কুল টিচার। কিন্তু তবুও বলব, যাকে আপনি জামাই হিসেবে পেয়েছেন, সে সাধারণ ছেলে নয়। আজকের এই স্বার্থপর পৃথিবীতে এত বড় মনের মানুষ আছে কি না আমার সন্দেহ আছে।

মাধবের দোকান থেকে পায়ে পায়ে বাড়ি এলেন উৎপলেন্দু। সূর্য এখন মাথার উপরে। বেশ একটু গরম লাগছে এখন।

এসে পড়েছেন পুরোহিত। শ্রাদ্ধকার্য শুরু হয়ে গিয়েছে। আত্মীয়স্বজন আর পাড়ার লোকজন এসেছে কিছু। এদিক-সেদিক খুচরো কিছু লোকের জটলা। যোগমায়া চায়ের কাপ আর শরবত নিয়ে ছোটাছুটি করছেন ঘন ঘন। উৎপলেন্দু একটা চেয়ারে বসলেন।

নিবারণের মন্ত্র উচ্চারণ শোনা যাচ্ছে, স্বর্গ বামেপার ব্রাহ্মণায় দদামি...।

উৎপলেন্দুর মেজাজ চটকে গেল। মৃত মানুষের আত্মাকে স্বর্গে পৌঁছে দিতে ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে টাকা দান করতে হবে! তা ছাড়া সংস্কৃত তো দূর, ভাল করে বাংলাও জানে না লোকটা। এই ভুল উচ্চারণের মন্ত্রধ্বনির জোরে তিথির আত্মা স্বর্গবাসী হবে?

নিবারণের গলা শোনা গেল আবার। প্যাঁকাটি না অগুরু কী একটা জিনিস যেন আনা হয়নি। দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে সে জিনিস আনতে হবে এক্ষুনি। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা নিরঞ্জনকে ডাকলেন যোগমায়া। একটা কাগজে কিছু লিখে দিয়ে পাঠালেন পাতাঝোরা বাজারে। প্রায় ছুট দিল নিরঞ্জন।

যোগমায়া এক গ্লাস শরবত নিয়ে এসে উৎপলেন্দুর সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, একটু শরবত খেয়ে নিন দাদা। শরীরটা ভাল লাগবে।

খানিকটা লেবুর শরবত গলায় ঢাললেন উৎপলেন্দু। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তেজ বাড়ছে একটু একটু করে। শরবতটা খেয়ে একটু আরাম লাগল যেন। যোগমায়া উঠে গেলেন। ফিরে এলেন একটু পরে। দই-মিষ্টির একটা প্লেট এনে দিলেন উৎপলেন্দুর হাতে। বললেন, এইটুকু খান।

উৎপলেন্দু জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিজে কিছু খেয়েছেন?

যোগমায়া একটু হাসলেন, এই তো, কাজটা হয়ে গেলেই খেয়ে নেব। আপনি খান।

উৎপলেন্দু অনিচ্ছাসত্ত্বেও চামচ দিয়ে এক টুকরো মিষ্টি মুখে দিলেন। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠল। ওষুধ গেলার মতো করে জল দিয়ে গিলে নিলেন মিষ্টির টুকরোটা। হে ঈশ্বর, এমন দিনও কপালে লেখা ছিল তাঁর!

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

**অঙ্কন: সুদত্তা বসু রায়চৌধুরী**

ডুয়ার্সের গল্প

# মোহনা

## মণিজিঞ্জির সান্যাল

আমার প্রথম প্রেম এক নিবিড় নির্জন পরিবেশে, একেবারে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলে। উষ্ণতার শেষতম পর্যায়ে। জ্যোৎস্নার ঝরনা আর জঙ্গলের নাম-না-জানা রাতজাগা পাখি ছিল আমাদের প্রেমের একমাত্র সাক্ষী, ছিল শেষের কবিতার শোভনলাল আর কেটিকে নিয়ে একপ্রস্থ তর্ক, কখনও বা পূর্ণেন্দু পত্রীর কথোপকথনকে নিয়ে টানাটানি, আবার শেলির সৌন্দর্য সম্পর্কিত ভাবকল্পনা এবং অ্যালাস্টর-এর সৌন্দর্যসত্তার অন্বেষণ বিহারীলালকে কতখানি অনুপ্রাণিত করেছে, তা-ই নিয়ে মারকুট সমালোচনা।

কলেজজীবনের প্রথম উন্মাদনা, মাত্র তিন দিনের পারমিশন মিলেছিল সেবার। বন্ধুরা মিলে সিনিয়রদের সঙ্গে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে বেরিয়েছিলাম ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলে। পৌঁছে গেলাম আমাদের নির্ধারিত রিসর্টে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে রওনা দিলাম আমাদের গাইডের হাত ধরে। আগেই ঠিক ছিল, প্রথম দিন কাছাকাছি নিজেদের মতো করে বেড়াব, গাইড থাক তার মতো, যার ইচ্ছে, সে গাইডের সঙ্গে যেতে পারে, আর যার ইচ্ছে, সে নিজের মতো কাছাকাছি বেড়াতে পারে। আমি তো বরাবরই ব্যতিক্রমী, জঙ্গলে বেড়াব গাইডের নির্দেশানুযায়ী, এ কি স্কুলের বিদ্যাপাঠ নাকি? আমি জঙ্গলে বেড়াব আমার মতো, আমার খুশিমতো, আমার খেয়ালে।

কলকাতার দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে একটু অক্সিজেন পেতে আমাদের সেই অভিযান, পাশাপাশি স্বাধীনতার স্বাদকে পুরোপুরি নিজের করে পাওয়ার জন্যে অদ্ভুত ব্যাকুলতা— এই দুইয়ের মেলবন্ধনে আমাদের সেই ডুয়ার্স ভ্রমণ।

আমরা ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ একসঙ্গে থাকার পর যে যার মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেলাম। আমরা কয়েকজন গোল হয়ে গাছের তলায় বসলাম, আর নিজেদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও প্রেম— এই নিয়ে শুরু হল আমাদের গল্পের আসর। সদ্য আঠারো ছাড়িয়েছি, পড়েছি উনিশে, কিন্তু তেমন কোনও অনুভূতি আমার শরীরে বা মনে জেগে ওঠেনি সেইভাবে, তাই অন্যদের গল্পকে গোগ্রাসে গিলছিলাম।

হঠাৎ আমার ছন্দপতন ঘটল, কীসের একটা টানে আমি ধীরে ধীরে সেই হাসিঠাট্টার আসর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম। একটা অদ্ভুত আবেশে আমি ভেসে চললাম সেই ঘন জঙ্গলের একদম মাঝখানে। দেখলাম জনহীন নিস্তব্ধ নির্জনে দু'জন যুবক আপন মনে হেঁটে চলেছে। সেই দু'জনের মধ্যে একজন আপন মনে গেয়ে চলেছে। আমি বিস্ময়ে হতবাক সেই সুরের মূর্ছনায়, ঈশ্বরের অসীম প্রভাব না থাকলে এমন সুন্দর সুর আর কণ্ঠস্বর কল্পনাও করা যায় না। সে আপন মনে গাইছিল— 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে...।'

আমি ওদের অনুসরণ করছিলাম খুব ধীর লয়ে। হঠাৎ যে ছেলেটা গাইছিল, সে 'কে?' বলে ঘুরে দাঁড়াল। আমিও থমকে গেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই বলে উঠলাম, 'আমি মোহনা, কলকাতার লেক গার্ডেনসে থাকি, বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছি।'

—মোহনা! ভারী সুন্দর নাম তো।

—আপনি তো ভারী সুন্দর গান, কী সুন্দর গলা। আমার কথাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠল, 'আমি সাগর।'

—আমি অরিন্দম। সাগরের পাশের ছেলেটি বলল।

—আপনারা কোথায় থাকেন?

—আপনার পাশের রাজ্যেই।

অরিন্দমের কথায় আমি হেসে উঠলাম আর বললাম, সত্যি, এমনভাবে কথাটা বলে উঠলেন, যেন আপনি আমার পাশের বাড়ি থাকেন, আমার প্রতিবেশী।

—পাশের বাড়ি আর পাশের রাজ্যের মধ্যে এমন কী দূরত্ব বলুন তো? পাশাপাশিই তো।

অরিন্দমের কথা শুনে আমি আবার হাসলাম। কথা বলতে বলতে খেয়াল করলাম, সাগর আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গিয়েছে। আমি ভাবলাম ছেলেটি কি একটু অহংকারী? আসলে কিছু ছেলে আছে, মেয়ে দেখলেই যেভাবে হামলে পড়ে, আলাপ করার জন্য কত বাহানা খোঁজে, সে তুলনায় এ স্রোতের প্রতিকূলেই আছে। সেই জন্যেই কি আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেটির প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে পড়লাম? অদ্ভুত এক ভাললাগা আমার শরীর আর মনে বয়ে গেল, একেই কি বলে প্রেম? একেই কি ভালবাসা বলে? এও কি সম্ভব?

আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ইংলিশ অনার্সের ক্লাসে সাহিত্যের নতুন দিগন্ত আমার চারপাশে। আবিষ্কার করে চলেছি একের পর এক নতুন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারদের। এদের মধ্যে কে কত বেশি উচ্চমার্গের, তা-ই নিয়ে ছিল লাইব্রেরি, কলেজ ক্যান্টিন, মাঠেঘাটে এক নির্ভেজাল বিনোদন।

এমনই একটা সময়ে ডুয়ার্সকে দু'চোখে দেখার জন্যে অদ্ভুত এক উন্মাদনা, তারপর বাড়ির লোকের পারমিশনের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা, এর পর সিনিয়র দাদা-দিদিদের তত্ত্বাবধানে ডুয়ার্সের প্ল্যানিং, সব মিলিয়ে সে এক দারুণ উত্তেজনা।

—আপনার সাবজেক্ট? অরিন্দমের সরাসরি জিজ্ঞাসা।

—ইংলিশ অনার্স, ফার্স্ট ইয়ার, ব্রেবোর্ন। আপনি... মানে... আপনারা?

—আমি থার্ড ইয়ার। আর বিষয়েরও অদ্ভুত মিল। অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল।

আমি ধরেই নিলাম, সাগরেরও তা-ই। দুই বন্ধু যখন একত্রে ভ্রমণে। আমি মনে মনে ভাবলাম, ছেলেরা বেশ বুদ্ধিমান আর টু দ্য পয়েন্ট কথা বলে। আর আমরা মেয়েরা একটা প্রশ্ন করলে দশটা উত্তর পরপর দিয়ে যাই।

হঠাৎ সাগর বলে উঠল, 'শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডি না কমেডি— কোনটা বেশি আকর্ষণ করে আপনাকে?'

সাগরের চলাটা একটু আলাদা, বেশ স্টাইলিশ। চলার সঙ্গে ওর কথা বলার ধরনও অ্যাট্রাক্ট করল।

আমিও স্বাভাবিক ছন্দে বললাম, 'দুটোই। তবে কমেডিকে একটু বেশি প্রাধান্য দেব।'

—কেন? সাগর যেন বেশ উৎসাহী আমার উত্তরের অপেক্ষায়।

আমি বললাম, 'কারণ শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডিগুলোতে যেমন পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্য, কমেডিগুলোতে তেমন নারীর। অলিভিয়া, মিরান্ডা, রোজালিন্ড— এইসব চরিত্র তাদের সৌন্দর্য, বুদ্ধি, সাহস এবং উদ্যোগে তাদের প্রেমিক বা পুরুষ সঙ্গীদের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়।'

—আসলে শেকসপিয়রের কমেডি জগৎ মূলত প্রেম ও রোমান্সের জগৎ, আর নারীদের পক্ষে এ জগতে তাই বিশেষ ভূমিকা নেওয়া স্বাভাবিক। আর সেই জন্যেই, মোহনা বোধ হয় শেকসপিয়রের কমেডির ফ্যান!

সাগরের কথায় আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা খুব কাছাকাছি চলে এলাম, মনের মিল বোধ হয় একেই বলে। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, যেটা কিনা একদম নিজের ভাললাগার জায়গা, সব কিছু মিলে গেলে অনুভূতিকে দূরে সরিয়ে রাখার বোধ হয় দরকার পড়ে না। আমি কেমন যেন সাগরের মধ্যে তলিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনে ফেললাম আমাদের দুটো রিসর্ট পরেই ওদের রিসর্টটা, যেখানে ওরা উঠেছে। আমরা তিনজনে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সাগর একটার পর একটা ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা বলে যাচ্ছে, আর অরিন্দম বলছে শেলির, আর আমি বয়ে বেড়াচ্ছি রবীন্দ্রনাথকে।

মাঝে মাঝে কাটাকাটা যুক্তিতর্ক, কখনও একই সুরে কাঁধে কাঁধ রেখে চলা। মনটা আমার অদ্ভুত দোলা দিচ্ছিল, প্রকৃতি কেমনভাবে যেন মিশে যাচ্ছিল।

হঠাৎ অরিন্দমের ফোন বেজে উঠল। ওর চোখ আর শারীরিক ভাষাই বলে দিচ্ছিল, ওর খুব কাছের বান্ধবীর ফোন। ও আমাদের দিকে একবার তাকাল। ও প্রান্তকে একটু হোল্ড করতে বলে আমাদেরকে বলল, 'সাগর, তোরা আড্ডা মার। আর মোহনা, ওকে একটু সাবধানে নিয়ে আসবেন।' অরিন্দমের তখন খুব তাড়া, যেন একটু সময়ও নষ্ট না হয়। প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর হয়ত এমনই বিচলিত করে মানুষকে। সাগর একটা হাত উঁচু করে একটু হাসল। অরিন্দমের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, ও যেন আমার অনুভূতিকে ধরে ফেলেছে, আর এই ছুতোটার জন্যই ও অপেক্ষা করছিল। কিন্তু 'ওকে সাবধানে নিয়ে আসবেন' কথাটা মনে পড়তেই আমি আপন মনে হেসে উঠলাম।

অরিন্দম চলে যাবার পর সাগর আমার হাতটা ধরল। আমার সারা শরীরে এক অদ্ভুত শিহরন জেগে উঠল। শরীর আর মন জুড়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি, এক অন্য আবেশ, এক অন্য ভাললাগার সৃষ্টি হল। জন্মজন্মান্তরেও আমি তা ভুলতে পারব না। একেই কি নারী-পুরুষের আকর্ষণ বলে? একেই কি বলে স্বর্গীয় সুখ? আমার শিরায় শিরায়, আমার শরীরের প্রত্যেকটা কোষ যেন সক্রিয় হয়ে উঠল।

আমি ধীরপায়ে চলতে লাগলাম ওর হাতে হাত রেখে। কথা বলতে লাগলাম শরীরের ভাষা দিয়ে। ওর দু'হাতের মুঠোর মধ্যে আমার তর্জনী, মধ্যমা যেন নতুন রূপে ধরা দিল। ও হঠাৎ গেয়ে উঠল, 'একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন জলে, সহসা কে এলে গো...'

আমার দু'চোখ জলে ভরে উঠল। নিঃশব্দে আমি কাঁদলাম। ও আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'মোহনা, তুমি কাঁদছ কেন?' ওর গায়ের গন্ধ তখন লেপে আছে আমার শরীরে। আমাকে স্বাভাবিক করার জন্য ও বলল, 'একটা নাচ দেখাও তো।'

—নাচ! আমি অবাক হলাম, এত কাছে এসেও সাগর কি দূরে সরিয়ে নিল নিজেকে! কিন্তু কেন!

—হ্যাঁ, নাচ। তুমি নাচ করো, আমি গাইছি।

আমি আশ্চর্য হলাম, আমি নাচ জানি ও জানল কী করে!

—তুমি নাচ জানো, আমি জানলাম কীভাবে?

সাগরের কথায় আমি বিস্মিত হতবাক। ও আমার মনের কথা বলছে কীভাবে? আমাকে ততটাই অবাক করে ও আবার বলল, 'তোমার তর্জনী, মধ্যমা সেই কথাই বলছিল।'

আমি অবাক হলাম, একটু অভিমান বুকের মধ্যে জমে উঠেছিল ঠিকই, তবুও আমি নেচেছিলাম চোখের জলকে চেপে রেখে। ওই গভীর অরণ্যে, গভীর সবুজের মধ্যে আমি নেচেছিলাম আমার জীবনের সেরা নাচটা ওর ওই ভুবন ভোলানো কণ্ঠস্বরের সঙ্গে। বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল আমার নৃত্যের শারীরিক আবেদন, নিবেদন, ছন্দ, অলংকার আর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল ওর সেই সুর, আর সেই সুরের মাদকতায় গভীর জঙ্গলে নেমে এল অন্ধকার।

আমার সমস্ত অভিমানকে ভুলিয়ে দিয়ে সাগর দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নিল। আমি ওর বুকে আছড়ে পড়ে কাঁদতে লাগলাম। আমি কেন কাঁদছিলাম জানি না। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি, যাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার দুটো গালকে ও দু'হাতের মধ্যে চেপে ধরল। ওর ঠোঁট দুটো ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আমার ঠোঁটের দিকে। তিরতির করে কাঁপতে লাগল আমার ছোট্ট গোলাপি ঠোঁট দুটো।

আমি নিজেকে মেলে ধরলাম ওর এক বুক উদার ভালবাসার কাছে। যুগ যুগ ধরে যেন ও আমাকে চুমু খেল। নতজানু হয়ে বসল আমার কোমর জড়িয়ে। আমার নাভিতে ও মুখ রাখল, চুমু খেল সময়কে ছাপিয়ে।

চাঁদ উঠেছিল তখন, জ্যোৎস্নার হাসিতে হারিয়ে গেলাম আমরা আমাদের মতো করে। ওর নিঃশ্বাসের প্রত্যেকটা তরঙ্গ আমার নাভির মধ্যে দিয়ে বয়ে গেল আমার শরীরের প্রত্যেকটা স্নায়ুকোষে। চুমুর মধ্যে যে এত কারুকার্য, অনায়াসে শুধু নাভিতে ঠোঁট রেখে যে সময়কে হারিয়ে ফেলা যায়, তা আমার অজানা ছিল। আমি মথিত হচ্ছিলাম ক্রমান্বয়ে।

টগবগে রক্তের আলোড়ন শুনতে পেলাম ওর কামনার ভেতর। আমি আবেশে কাঁপছিলাম, প্রকৃতির ভাষার সঙ্গে যা মিশে যাচ্ছিল কানায় কানায়, রাতের পুরুষালি চেহারা আমি উপভোগ করেছিলাম আমার মতো করে, তাতে বন্য আদিমতা ছিল না, ছিল শিল্পের কারুকলা, যেন পাহাড়ের ঝরনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেতে যাওয়ার মতো ভাললাগার উষ্ণ পরশ। নদীর উপর যেন ঢেউ, তার উপর ঢেউ, তার মধ্যে যেন ধীর লয়ে চলা দুটো ছোট্ট ডিঙি। হঠাৎ ঝড়ে ঢেউয়ের ধাক্কা, তাতে উথালপাথাল, তারপর যেন হালকা ঢেউয়ের খেলা।

ফিরে এসেছিলাম ওর হাত ধরে। রিসর্টের মুখোমুখি হতেই অরিন্দম। সাগর একটা হাত রাখল অরিন্দমের কাঁধে। আমার দিকে অরিন্দম তাকাল, সে এক অদ্ভুত চোখ। না, কোনও খারাপ সে ভাষা নয়, বরং সে চাউনির মধ্যে ধরা পড়ল অপত্যস্নেহ।

সাগরের স্পর্শকে, সাগরের গায়ের গন্ধকে বয়ে নিয়ে নিঃশব্দে আমি আমার রিসর্টে ঢুকলাম। বন্ধুদের সব ক'টা চোখকে উপেক্ষা করে আমি সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বন্ধুরা কেউ কিছু না বললেও, আমার খুব কাছের বন্ধু পৌলোমী কানের কাছে এসে বলল, 'কিচ্ছু খাবি না?' আমি শুধু মাথা নাড়লাম। ও বলল, 'ঠিক আছে, শুয়ে পড়, কাল কথা হবে।'

খুব ভোরের দিকে ঘুমোলাম। অদ্ভুত এক গভীর ঘুম, যেন অনেক দিনের জমে থাকা ঘুম। সেই ঘুম যখন ভাঙল, ঘড়িতে তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। কারও কোনও আওয়াজ পেলাম না। তাড়াতাড়ি চোখ-মুখ ধুয়ে বার হলাম, শুনলাম বন্ধুরা সবাই আশপাশেই বেড়াতে গিয়েছে। হঠাৎ দেখলাম পৌলোমীর অনেকগুলো মিসড কল। তারপর মেসেজ। ও লিখেছে— অনেক রাত অবধি জেগে ছিলিস তুই, তাই বিরক্ত করিনি। ঘুম ভাঙলে ফোন করিস। আমরা আশপাশেই

# উন্নত হলদিবাড়ি আমাদের প্রতিজ্ঞা

হলদিবাড়ি একটি পুরনো বাণিজ্যকেন্দ্র। তিস্তার পাড়ে এর ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রাচীন কাল থেকে বাণিজ্য তরী এসে ভিড়ত এই জনপদের ঘাটে। ১৮৯৮ সালে টাউন হলদিবাড়ির প্রতিষ্ঠা। ১৯৮৪ সালের ২৬শে নভেম্বর পেয়েছে পুরসভার মর্যাদা। বর্তমানে মেখলিগঞ্জ সাব ডিভিশনের আওতায় থাকা এই শহরের মানুষকে তিস্তার অপর পাড়ে অবস্থিত মেখলিগঞ্জে যেতে হয় জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি হয়ে প্রায় ৬০ কিলোমিটার পথ উজিয়ে। তিস্তার ওপর একটি সেতু নির্মিত হলে এই সমস্যা থেকে বাঁচত হলদিবাড়ি।

আর সেই বহু প্রত্যাশিত সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভবিষ্যতের হলদিবাড়িকে সাজিয়ে তোলার জন্য তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে বর্তমান পুরসভা।

আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পর পথ ঘাট সাজাতে শুরু করেছি ত্রিফলা আলোয়। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে স্থাপন করেছি হাইমাস্ট আলোক স্তম্ভ। এর ফলে হলদিবাড়ির পথে আজ আলোকের বন্যা। দেয়ালির আগে এর চাইতে ভাল আর কী-ই বা হতে পারে।

হলদিবাড়ির প্রাচীন গোপালক কেন্দ্রটিকে সংস্কার করেছি আমরা। এটা ছিল বহুদিনের দাবী। আগামীতে হলদিবাড়ি হয়ে উঠতে চলেছে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর। সীমান্ত লাগোয়া এই শহরকে দ্রুত উন্নয়নের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে তাই প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে হলদিবাড়ি পুরসভা।

**হলদিবাড়ি পৌরসভা
সবাইকে জানায়
দীপাবলীর প্রীতি ও শুভেচ্ছা**

তরুণ দত্ত
পৌরপতি, হলদিবাড়ি পুরসভা

বেড়াচ্ছি, ইচ্ছে হলে চলে আয়, ব্রেকফাস্ট করে নিস, বাই।

পৌলোমীকে মনে মনে থ্যাঙ্কস জানালাম। তারপর সোজা ছুটলাম সাগরদের রিসর্টের সামনে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর ওদের রিসর্টের ম্যানেজারের কাছে জানতে চাইলাম সাগররা রিসর্টে আছে, না বেরিয়ে পড়েছে। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, সাগররা রিসর্ট ছেড়ে চলে গিয়েছে।

—মানে! আমি বিস্ময়ে হতবাক।

—হ্যাঁ, ওঁদের আরও দু'দিন থাকার কথা ছিল। ওঁরা পাঁচ দিনের জন্য রিসর্টটা বুক করেছিলেন। কিন্তু আজ খুব ভোরে ওঁরা রিসর্ট ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

—মনে হয় আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।

—আপনি সাগরবাবুর কথা বলছেন তো? অন্ধ যিনি!

—অন্ধ!

—হ্যাঁ, উনি তো ভিশুয়ালি ইমপেয়ার্ড। পরীক্ষার সময় ওঁর একজন রাইটার লাগে। অরিন্দমবাবু গল্প করছিলেন। অসম্ভব মনের জোর, আর ওঁর চলাফেরা এত স্বাভাবিক যে, ওঁকে সহসা ধরা যায় না। তবে উনি জন্মান্ধ নন, একটা দুর্ঘটনায় উনি প্রাণে বাঁচলেও, ওঁর চোখ দুটো পুরো অকেজো হয়ে যায়। সকালবেলায় অরিন্দমবাবু বললেন যে, ওঁরা ফিরে যাবেন। ম্যাডাম, আপনার কি কিছু...

আমি নিঃশব্দে চলে এসেছিলাম ওই রিসর্টের সামনে থেকে। ভাষাগুলো কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বাতাসটা কেমন যেন বিষাক্ত মনে হতে লাগল। জীবনটা কেমন যেন মিথ্যে হয়ে গেল। প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য এক মুহূর্তে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেল।

চলে এসেছিলাম ডুয়ার্স ছেড়ে কলকাতায়, আবার সেই দমবন্ধ করা কলকাতায়। স্নান করেছিলাম সে দিন বাথটাবে। আমার সবুজ রঙের বাথটাবে। খেলা করছিলাম সাগরকে নিয়ে। আমার শরীরের সমস্ত কোষ ধুয়ে যাচ্ছিল বাথটাবের ফেনার মধ্যে। ঘষে ঘষে আমি কি ওর সত্তাকে মুছে ফেলতে চাইছিলাম? ওর গন্ধ, স্পর্শ সব কিছু ফেনার সঙ্গে মিশে গিয়ে কলকাতার নর্দমার মধ্যে জমা পড়ছিল কি?

আজও মেঘলা দিনে কলকাতার ছ'তলার ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে যখন দাঁড়াই, তখন মনের আকাশটাও কেমন যেন মেঘলা হয়ে যায়, খুঁজে বেড়াই মনের আকাশটাকে।

ঝিরঝিরে হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো যখন খসে পড়ে, একটু একটু করে বসন্ত যখন শরীর থেকে দূরে সরে যায়, তখনও আমি হেঁটে চলে যাই ঘিস নদীর ধারে, কখনও বা ডায়নার তীরে, কখনও বা হাঁটতে থাকি গভীরে, আরও গভীর সেই জঙ্গলে...।

**স্কেচঃ সুবল সরকার**



# ডুয়ার্স থেকে মহানগর

জলপাইগুড়ি শহরে সর্বোচ্চ দূরত্ব বলতে ছিল কদমতলা বাস স্ট্যান্ড কিংবা বেগুনটারির মোড়। আর সেই কুয়োর ব্যাং যখন সাগরে এল, দেখা গেল, এক কাপ চা খেতেও প্রায় ১৫ মিনিট হাঁটতে হয়। পথে বেরলেই অমুক মামা, তমুক জ্যাঠার চেনা মুখের হদিশ তো নেই-ই, কেবল যন্ত্রের মতো কিছু মানুষ বাস এলেই একে অপরকে ঠেলে সার্ডিন মাছের মতো কৌটোয় ঢুকে পড়ে। তাদের গরম লাগে না। তাদের পায়ে ব্যথা করে না। এমনকি তারা জোরে ব্রেক কষলেও পড়ে যায় না। তারা সকলেই অতিমানব। কিংবা আমি অতি সাধারণ।

ছোটবেলায় অভ্যাস ছিল বাইরে থেকে বাড়ি এসেই সিঁড়ি থেকে 'মা! মা!' চেঁচাতে চেঁচাতে ঘরে ঢোকার। সবসময় যে মাকে দরকার হত তা নয়, তবে মা ঘরে আছেন জানলে অদ্ভুত একটা তৃপ্তি হত। সেই তৃপ্তির কোনও ব্যাখ্যা হয় না।

বাড়িতে সবচাইতে ছোট হবার সুবিধার্থে বা অসুবিধার্থে কখনও যাকে এক গ্লাস জল নিজে ভরে খেতে হয়নি, তার পক্ষে মা ছাড়া শহরে একা একখানা বাড়িতে সারাদিন যন্ত্রমানব পরিবেষ্টিত হয়ে থাকাটা খুব সহজ ছিল না। তবে কথায় আছে না, সময়ই সবচাইতে বড় শিক্ষক। সময় আর পরিস্থিতি সব কিছু বদলে দিতে সক্ষম। তাই যখন দেখলাম ছোট ছোট প্রতিকূলতার আড়ালে ছোটবেলা থেকে লালিত সব স্বপ্ন দৃপ্তমান, তখন একদিন সকালে মাকে আর অত দূরে মনে হল না। ফোন করলেই তো মা আছেন। বাসের মধ্যে আমার পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকও দেখঘলাম রুমাল দিয়ে কপাল মোছেন। আর বাস থেকে নামলেই সামনে প্রকাণ্ড একটা বিল্ডিং— ইঞ্জিনিয়ার তৈরির জাদুঘর। আমার কলেজ।

ডুয়ার্স অঞ্চল থেকে যারা কলকাতায় পড়তে আসে, তাদের মধ্যে একটা ভিন্ন টান থাকে। ছোটবেলায় দেখতাম, ঠাকুরদা কারও পূর্ববাড়ি বাংলাদেশে শুনলে ঝাঁপিয়ে পড়ে লতায়-পাতায় একটা যোগ খোঁজার চেষ্টা করতেন। আর খুব আনন্দে চেঁচাতেন, 'আরে! এরা তো আমাদেরই গ্রামের!'— ঠাকুরদার সেই ব্যাপারটা আমিও বেশ উপলব্ধি করতে লাগলাম। একদিন একজনের সঙ্গে আলাপ হল, তার বাড়ি কোচবিহারে। কিছুই চিনি না, তবু বললাম, 'মদনমোহন বাড়ির পাশে?' সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি থেকে ২০ মিনিট।' আমি বেশ আনন্দ প্রকাশ করলাম। আর আমার পাশে বসা বেহালা থেকে রোজ সল্ট লেক আসে যে ছেলেটা, সে ভাবল আমরা একই পাড়ার হয়ত। ওদের কাছে তো ২০ মিনিট মানে— এক পলক!

কিছুদিনে, উত্তেজনা কমার পর বুঝলাম, বিষয়টা আনন্দ বা উত্তেজনার নয়। বিষয়টা দায়িত্বের। দায়িত্ব বিশ্বাস রাখার। কথা রাখার। ১৮ বছর বয়স। পকেটে এটিএম কার্ড। হাতে মোবাইল ফোন। আর সবচাইতে সাংঘাতিক রসদ— স্বাধীনতা। তবে দায়িত্ব শুধু, সব কিছুর সঠিক ব্যয় করার।

কয়েকজনকে দেখলাম নিছক কলকাতাজাত হওয়ার চেষ্টায় বড্ড ব্যাকুল। ছোট জামা, হাতে সিগারেট, চুলে রং আর পার্ক স্ট্রিট। যেন B-town tag-টা ঝেড়ে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা।

আমি আমার B-town tag ছেড়ে ultra modern হতে চাইনি কখনও। আমার শহর, আমার উৎস আমার লজ্জা নয়। বরং আমি মনে করেছি, Calcutta Boy's-এর যে ছেলেটা আমার সঙ্গে একই কলেজে পড়ে, সে যখন ল্যাবে ঝরঝরে ইংরেজিতে আমায় কিছু প্রশ্ন করে, তখন যে আমিও স্বচ্ছন্দে উত্তর দিতে পারি, তাতে হয়ত কোথাও ক্যালকাটা বয়েজ আর জলপাইগুড়ি রাষ্ট্রীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এক হয়ে যায়।

**ঐশ্বর্যা মুখোপাধ্যায়**

আপনার এলাকার পথঘাটের অবস্থা কী? নিকাশি-নালা-নর্দমা কিংবা ভ্যাট নিয়মিত পরিষ্কার হয়? পথবাতিগুলি কি সন্ধে হলেই জ্বলে ওঠে? খেলাধুলোর জন্য যে মাঠটি ছিল, ঘুরে বেড়ানোর পার্ক, পাড়ার একটিমাত্র পুকুর কী অবস্থায় আছে তারা? আপনি ছাড়া আর কারও পক্ষে কি সে খবর রাখা সম্ভব? তাই আপনাকেই জানাতে হবে আপনার পাড়ার কথা আপনার নিজের কথায়। চটপট লিখে ফেলুন আর ই-মেল অথবা ডাকে পাঠিয়ে দিন। ই-মেল ঃ ekhonduars@yahoo.com। ঠিকানা ঃ বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯।

# সম্প্রীতির প্রতীক বনদুর্গা বুড়িমাতা

অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দুধর্মে শত শত বর্ষ ধরে বেশ কিছু দেবদেবীর পুজো হয়ে আসছে। দিনহাটা সেরকমই এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছে। এখানকার বনদুর্গা মানুষজনের পুজো পেয়ে আসছেন বহুকাল ধরে।

কথিত আছে, দিনহাটা মহকুমার পুঁটিমারির বাসিন্দা আসমতউল্লাহ বক্সী, হেমানন্দ রায় বক্সী এবং শ্রীনাথ রায়বর্মা কোচবিহার রাজ আমলে খাজনা বিষয়ক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। রাজকার্যে একদিন অবিভক্ত বাংলার রংপুর পরগনার অন্নদানগরে তাঁদের রাত্রি যাপন করতে হয়। ওই অন্নদানগরে প্রায় দু'শো বছরের একটি বনদুর্গার পুজোর প্রচলন ছিল। রাতে বুড়িমাতা তাঁদের স্বপ্নাদেশ দেন— পুঁটিমারি গ্রামে তোরা আমার পুজো করিস। সেই রাতে বুড়িমা মূর্তির আদলও বলে দেন স্বপ্নাদেশে। আশ্চর্যের বিষয় হল, রাজকাজে নিযুক্ত তিনজন কর্মীকেই একসঙ্গে স্বপ্ন দেখান বুড়িমাতা।

অন্নদানগরের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে যে যার মতো নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে বেমালুম ভুলে গেল বুড়িমাতার আদেশ। কিছুদিন পর বুড়িমাতা তাঁদের নিজ বাড়িতে আবার স্বপ্নাদেশ দেন পুজো করার। এবার আর দেরি নয়, পরদিন গাঁয়ের দু'-চারজনকে ডেকে সব ঘটনা বলার পর পুজোর তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। যদিও স্থানীয় কারিগররা কেউ এই বনদুর্গার মূর্তি গড়তে পারলেন না। অবশেষে অনেক খোঁজ করে ভেটাগুড়ির কাছে বালাডাঙা গ্রামে পাওয়া গেল নরেন মালাকরকে। তাঁকে দিয়ে চলল মূর্তি গড়ার কাজ। আজও বংশপরম্পরায় তাঁরা মূর্তি তৈরি করেন। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিতে এই বুড়িমাতার পুজো অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বুড়িমাতা সিংহের উপর অধিষ্ঠিত। কোল জুড়ে এক হাতে রয়েছে শিশু, অন্য হাতে অভয় মুদ্রা।

এবারের পুজো ১৩১ বছরে। জৌলুস নয়, ভক্তপ্রাণ মানুষের ভক্তিরসে পূর্ণ এই বুড়িমাতার পুজোকে ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনার কোনও ঘাটতি থাকে না। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। আসমতউল্লাহ বক্সী, হেমানন্দ রায় বক্সী এবং শ্রীনাথ রায়বর্মা— কেউই বেঁচে নেই। তাঁদের উত্তরসূরিরা এই পুজোকে ধরে রেখেছেন। এখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একাত্ম হয়ে পুজো করে আসছে।

তিনজনের বর্তমান প্রজন্মের বংশধররা সক্রিয়ভাবে পুজো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন— মানবেন্দ্র বর্মা, সামন্ত রায় এবং আবদুল লতিফ আহমেদ। এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। উত্তরের এই চাতালে বনদুর্গা তথা বুড়িমার পুজোকে ঘিরে তৈরি হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ, যা এই অস্থির সময়ে খুব বেশি জরুরি।

এবারও পুজো উপলক্ষে মেলা বসেছিল সপ্তাহভর। সাত দিনের এই মেলা শুরু ১৮ অক্টোবর আশ্বিন সংক্রান্তির দিন। উত্তরবঙ্গ তো বটেই, ডুয়ার্স এবং নিম্ন অসমের ভক্তপ্রাণ মানুষ ছুটে আসেন বুড়িমাতার এই পুজোয়।

**শুভাশিস দাস**

---

# সেই জলপাইগুড়ি কি বদলে গিয়েছে?

ছোট শহর বলে সেই সময় সবাই সবাইকে চিনত— মুখচেনা। প্রায়ই পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট ম্যাচ হত। এই চেনার জন্য প্রেম পর্ব হত গোপনে গোপনে। বাবুপাড়ার করলা এখনকার মতো এত শীর্ণ ছিল না, বিকেলবেলায় বাঁধের ধারে বসত বিহারি চানাচুরওয়ালা— বাদাম, ছোলা, মটর, লংকা ও পেঁয়াজ নিয়ে বসে থাকত কুপি জ্বালিয়ে। তখন চার আনায় পেতাম— এক কোঁচড় বাদাম। দুর্গা পুজোর সময় আমাদের ঠাকুর নৌকোয় চড়ত বাবুঘাট থেকে এবং রায়কতপাড়া গিয়ে ফিরে আসত, বিসর্জন হত বাবুঘাটের সামনে। নৌকায় থাকত গোপালদা, পিন্টু, গবা, দোলন, কাজলদা, নিমাইদা, আরও অনেকে। ফাটানো হত বিশাল বিশাল ওয়াটার বম, বোতল বম।

বর্ষায় করলা ধরত রুদ্রমূর্তি— সবচেয়ে আগে ভাসত বাবুপাড়া, রায়কতপাড়া এবং শিশুমহল স্কুল সংলগ্ন পাড়া, তিস্তা নদী থেকে গভীর রাতে গুমগুম আওয়াজ আসত আর আমরা বন্যার ভয়ে প্রহর গুনতাম। করলার লাল ব্রিজ দু'বার আমি তিস্তার বন্যায় ভাঙতে দেখেছি। বাবুপাড়াতে ছিল খ্রিস্টানদের এক কবরস্থান— ওটা আর নেই— ১৯৬৮-এর বন্যায় জলপাইগুড়ি শহরের অনেক চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। যেমন পিলখানার অদূরে অবস্থিত 'টিপি'— তিস্তার গর্ভে। দুটো বাঁধের কোনও সংস্কার হয়নি, কারণ তিস্তার পথ পরিবর্তন। প্রথম বাঁধটি রেল লাইনে শেষ ছিল। ওখানে এখন ঘনবসতি। দিনবাজার স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে— শহরের অনেক জায়গায় বাজার বসেছে, যেমন স্টেশন বাজার। রেলওয়ে স্টেশনে তার পুরানো হাত সিগনাল ব্যবস্থা। যোগমায়া কালীবাড়িও একইভাবে এখনও আছে।

বাহন বলতে তখন ছিল রিকশা, তাও সন্ধ্যার পর কমে যেত। অধিকাংশ বাড়িতে ছিল একটি বা দু'টি সাইকেল। রাত আটটার পর 'শহরের' চোখে নেমে আসত ঘুম। চা-বাগান এবং গভর্নমেন্ট অফিস ছাড়া জলপাইগুড়ি ছিল উত্তরবাংলার 'কালচারাল হাব'— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতি বছর আসতেন এবং থাকতেন বাবুপাড়ায় তাঁর আত্মীয়ের বাড়ি। নরেন্দ্রনাথ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবীকে আমরা খুব কাছ থেকে দেখেছি। কলেজ ছিল দু'টি— এসি কলেজ ও পিডি কলেজ (মহিলা)। এই কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী হয়েছেন। আর্য নাট্য সমাজ হল ও বান্ধব নাট্য সমাজ হল-এ তখন নানারকম নাটক, নৃত্য প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত। শেকসপিয়রের 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। নাটকের কুশীলবরা যেমন— চিন্ময় ভাদুড়ি, শরণ চট্টোপাধ্যায়, ড. দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস আর নেই।

**ড. শিবাজী বিশ্বাস**

# দিওয়ালির দিনগুলি নিরাপদে কাটান

## বাড়িতে অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও প্যারাসিটামল ট্যাবলেট থাকা জরুরি

এই ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠান্ডা-গরমে সবারই সর্দিকাশি-জ্বরের প্রবণতা দেখা দেয়, বিশেষ করে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। সকালে চড়া রোদ ও গরমে হালকা পোশাক পরাতে হবে। আবার রাতের দিকে ঢাকা জামাকাপড়। খাওয়ার আগে-পরে অবশ্যই ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। জ্বর হলে বড় বা ছোট উভয়ের ক্ষেত্রেই প্যারাসিটামল দিতে হবে। তরল পদার্থ বা জলীয় জিনিস খেতে হবে বেশি। তা-ই বলে বাজার চলতি লাল-নীল রঙের বোতলবন্দি পানীয় যত কম খাওয়া যায়, তত ভাল। জ্বর দুই বা তিন দিনে না কমলে অবশ্যই ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। আর কালী পুজোতে শব্দবাজি একেবারেই নয়। আওয়াজ ৬০ ডেসিবেল পেরলেই বাচ্চা-বড় প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ক্ষতিকারক হতে পারে। এমন ধরনের কিছু রংমশাল ব্যবহার না করা উচিত, যাতে ধোঁয়ার পরিমাণ বেশি হয়। বাজি পোড়ানোর সময় বাচ্চার সঙ্গে অবশ্যই বড়দের থাকতে হবে। কোথাও পুড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। তারপর কোনও অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম লাগাতে হবে। বাড়িতে তাই অ্যান্টিসেপটিক মলম থাকা প্রয়োজন, যা কাটা বা পোড়া দুইয়েই কাজে লাগে। তার পরের সমস্যায় তো ডাক্তার আছেনই।

**ডা. সৌমিক গাঙ্গুলি**

## বাজিতে চোখ দুটো বাঁচিয়ে

বাজি পোড়াতে গিয়ে চোখে আঘাত লাগার ঘটনা প্রত্যেক দিওয়ালিতেই প্রচুর পরিমাণে ঘটে। ছোটদের তো বটেই, বড়রাও অনবধানবশত চোখে আঘাত পান। লক্ষ করে দেখেছি, দিনের বেলায় বাজি পোড়াতে গিয়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। কারণ সূর্যের আলোয় বাজির আলো আলাদা করে বোঝা যায় না। অতএব দিনের আলোয় বেশি সাবধান থাকতে হবে।

কেবল আগুনের ফুলকিই নয়, শব্দবাজির মশলাও চোখে ঢুকে গিয়ে কর্নিয়ার ক্ষতি করতে পারে। কর্নিয়া ফেটে যেতে পারে অথবা রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। বাজি পোড়াতে গিয়ে আচমকা চোখে আঘাত পেলেই যে চোখটি অক্ষত রয়েছে, সেটি বন্ধ করে দেখতে হবে আঘাতপ্রাপ্ত চোখে দৃষ্টি স্বচ্ছ রয়েছে কি না। থাকলে ঠান্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যদি চোখে দেখতে অসুবিধা হয় তাহলে জল দিলে বিপদ বেড়ে যাবে। অতএব এখানেও সাবধান থাকতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, টানা বাজি পোড়ানোর পর মাঝরাতে বা ভোরের দিকে চোখ ব্যথা করছে। আসলে বাজির আলোর রোশনাই রেটিনার উপর প্রভাব ঘটাতে কয়েক ঘণ্টা সময় নেয়। তবে এত ভয়ের কিছু নেই। খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নিলেই বা চোখ বন্ধ করে থাকলেই ব্যথা কমে যায়।

দিওয়ালির সময় আমরা চোখের ডাক্তাররা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি আপৎকালীন চিকিৎসার জন্য। কিন্তু সবাইকে বলব, নিজেদের এবং ছোটদের ক্ষেত্রে আগাম সাবধানতা নিলে কোনও চিকিৎসার দরকার পড়বে না। আর বিপদ ঘটলে চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো আশু কর্তব্য, চোখ বলে কথা।

**ডা. ডি বি সরকার**

## সবচেয়ে বেশি বিপদ হতে পারে চোখে

দিওয়ালিতে বাজি পোড়াতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হতে পারে চোখের। বাজির শব্দ এবং আগুন দুই-ই চোখের পক্ষে ক্ষতিকারক। এ সময়ে হাসপাতালে বাজির আগুনে জখম চোখ নিয়ে আসা রুগির সংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আগুনের ফুলকিতে চোখের পাতা পুড়ে যায়। আরও মারাত্মক হয় কর্নিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে। সে ক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি হারানোর সম্ভাবনা থেকে যায়। দুর্ঘটনাক্রমে চোখে বাজির আগুন বা ফুলকি কিংবা ছ্যাঁকা লাগলে আহতকে কোনক্ষ্ম ওরকম জলের ঝাপটা কিংবা হাত বা কাপড় দিয়ে ঘষাঘষি না করে, যত দ্রুত সম্ভব চোখের অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ কিনে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ডাক্তারি চিকিৎসা শুরু হতে যত দেরি হবে, ক্ষতির পরিমাণ তত বেড়ে যাবে। দিওয়ালিতে তাই সবচেয়ে বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় চোখ নিয়ে। আর শিশুদের ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হয় অনেক বেশি।

**ডা. পল্লব তরফদার**

# ঝাঝাঙ্গি ধাবা বাকিদের থেকে আলাদা

ডুয়ার্স ভূখণ্ডে যদি ধাবার কথা বলেন, তবে প্রথমেই ঝাঝাঙ্গির কথা উঠবে। ময়নাগুড়ি থেকে ১০ কিলোমিটারও নয় ঝাঝাঙ্গি। বাস স্টপে নেমে ২০০ মিটার হাঁটলেই রকমারি চার চাকা আর দু'চাকায় মুখ ঢেকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখ খুলে থাকে সেই ধাবা।

চলে যাওয়া শতকের আটের দশকের মাঝামাঝি উত্থান ঝাঝাঙ্গি ধাবার। তখন ওই বাস স্টপ থেকে ১০০ মিটার হাঁটলেই ঝোপজঙ্গল আর সাপখোপের আড্ডা। সেখানেই অনেকটা জমি নিয়ে ধাবার প্রতিষ্ঠা। এমন নয় যে ওটাই ছিল ডুয়ার্সের প্রথম ধাবা। জাতীয় সড়কের ধারে ধাবা কোনও নতুন জিনিস নয়। দূরদূরান্ত পাড়ি দেওয়া ট্রাকচালকদের জিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাঠের ফ্রেমে দড়ির বিছানার চারপাই সাজিয়ে, কিছু খাবারদাবার আর জলের ব্যবস্থা নিয়ে ধাবা অনেক আগে থেকেই ছিল। গাড়ির চালক আর খালাসি ছাড়া ছেলেছোকরার দল মাঝে মাঝে যেত মোষের দুধের এলাচের গন্ধ মাখা সুস্বাদু চা খেতে কিংবা গোপনে সুরাপান করতে। মনে রাখতে হবে যে, তিরিশ বছর আগে ডুয়ার্সে 'বার' ব্যাপারটা প্রায় ছিলই না। লিকার শপ-এর অভাব ছিল না বটে, কিন্তু পান করার জায়গার ছিল ঘোরতর অভাব। ধাবাই ছিল বিকল্প।

ডুয়ার্সের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া জাতীয় সড়ক বেয়ে অগুনতি পণ্যবাহী গাড়ি যায়-আসে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে। সেই তুলনায় ডুয়ার্সে তেমন উচ্চমার্গের ধাবা ছিল না। মোটামুটি একটা স্নান আর হালকা হওয়ার ব্যবস্থা। বাঁশ আর টিন দিয়ে বানানো ঘরে কয়েকটা খাটিয়া আর রুটি-তরকা-মাংস-সুরার আয়োজন। সামনে তেমন জায়গাও নেই যে দৈত্যাকার বাহনগুলি দাঁড়াতে পারে। দাঁড়ালেও দ্বিতীয়টির জায়গা ফুরিয়ে যায়। ঝাঝাঙ্গি ধাবা গোড়াতেই এদিকগুলো তলিয়ে ভেবেছিল বলে অচিরেই জনপ্রিয় হয়।

কেবল পণ্যবাহী গাড়ির লোকজনদের জিরিয়ে নেওয়া নয়, সাধারণ মানুষও যাতে পরিবার নিয়ে আসতে পারে— এটা মাথায় রেখে ঝাঝাঙ্গি ধাবায় উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার দিকটা ভাবা হয়। এমনিতে ধাবায় খাদ্যের তেমন বৈচিত্র থাকে না। ঝাঝাঙ্গি ধাবাতেও যে রকমারি খাবার পাওয়া যায়, তাও

## তরকা

**উপকরণ**- যে কোনও ডাল (মুগ, মসুর/বুট কিংবা মিক্সড), ১টা পেঁয়াজ, ২টো লংকা, ২টো টম্যাটো, ১ চিমটে জিরে, ১ চামচ গুঁড়ো লংকা, সামান্য হলুদ গুঁড়ো, ২ টেবিল চামচ তেল, শুকনো লংকা, খানিকটা ধনেপাতা কুচি, ১ চামচ ঘি।

**পদ্ধতি**- পেঁয়াজ, লংকা, টম্যাটো কুচিয়ে নিন। প্রেশারে নুন আর হলুদ মেশানো ডাল ভাল করে সেদ্ধ করে ফেলুন। প্যানে তেল গরম করে জিরে ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ আর লংকা কুচি মিশিয়ে দিন। তারপর টম্যাটো কুচি দিন। ঢিমে আঁচে মিশ্রণ নরম হওয়া অবধি অপেক্ষা করুন। একটু নেড়ে নিন।

এর পর ডাল সেদ্ধ ঢেলে দিয়ে আঁচ একেবারে ঢিমে করে দিন আর সাঁতলাতে থাকুন। এই সাঁতলানোর উপর নির্ভর করবে তরকার স্বাদ। হয়ে গেলে নামিয়ে রেখে ধনেপাতার কুচি দিয়ে ঢেকে রাখুন। আরেকটা প্যানে ঘি গরম করে তাতে একটু জিরে আর লংকা ভেজে নিন। উনুন থেকে নামান। অন্য প্যান থেকে মিশ্রণটা ঢেলে দিন। ঢেকে রাখুন খানিকটা। এক কাপ ডালের সাপেক্ষে এই রেসিপি।

## আমলকীর মোরব্বা

**উপকরণ**- আমলকী, মধু, ভিনিগার, আদা, শুকনো লংকা, নুন।

**পদ্ধতি**- আমলকীর মধ্যে সুচ বা কাঁটা চামচ দিয়ে ছিদ্র বানিয়ে নিতে হবে কয়েকটা। একটু বড়ো আমলকী নেবেন। জলে ফিটকিরি গুলে অন্তত দশ ঘণ্টা জল ভিজিয়ে রাখুন। প্রতি দু'ঘণ্টায় তিনবার অন্তত দ্রবণ বদলে দিতে হবে। তারপর আমলকীগুলো থেকে হালকা চাপ দিয়ে বা ঝাঁকিয়ে জল বার করে নিন।

এবার জলে নুন মিশিয়ে আমলকী সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ ফল থেকে জল ঝরিয়ে নিলে স্বাদ ভাল হবে। শেষ ধাপে আরেকটি পাত্রে আদা কুচি, ভিনিগার, মধু, শুকনো লংকার মধ্যে সেদ্ধ ফলগুলি দিয়ে হালকা গরম করুন আর নাড়তে থাকুন। যখন ঘন আর আঠালো হয়ে যাবে, তখন নামিয়ে ঠান্ডা করে একবার খেয়ে দেখুন। দেখবেন, জিবের জল বাগ মানছে না!

২৫০ গ্রাম আমলকীর জন্য ১ কাপের একটু বেশি মধু আর আধ কাপের মতো ভিনিগার হলেই চলবে।

বিরাট স্নানাগারে পরিষ্কার জলের অবিরাম সরবরাহ। জল তুলে স্নান করার জন্য বাঁধানো ঘাট। চমৎকার নিকাশি ব্যবস্থা। দূরে সার সার টয়লেট। প্রতিবার ব্যবহারের পর সাফাই করে দেওয়ার জন্য কর্মচারী। সার সার খাটিয়া পাতা এক বিরাট ঘর, বিশ্রামের জন্য। আলো- হাওয়ার ভাল ব্যবস্থা। অন্য দিকে খাবার জন্য চেয়ার-টেবিল এবং দড়ির খাটিয়া— দু'ধরনের আয়োজনই আছে।

নয়। রুটি-তরকা-মাটন-চাটনি, মোরব্বা-লাড্ডু-রাবড়ি— এই হল মেনু কার্ড। ভাত-সবজিরও ব্যবস্থা আছে। এর জন্য রাশি রাশি ট্রাকচালক আর সাধারণ মানুষ দূরদূরান্ত থেকে এখানে ভিড় জমাতে আসে, সেই রহস্য জানতে অনুসন্ধানে নামতে হল আমাদের। বিশাল কয়েকটা স্টিলের বিম নিয়ে গোপাল প্রসাদ তাঁর বাইশ চাকার পেল্লায় গাড়িতে কোহিমা যাওয়ার পথে সকাল আটটা নাগাদ ঝাঝাঙ্গি ধাবায় নেমেছেন। এখানে এক বেলা জিরিয়ে নেবেন বলে গত দু'দিন থামেননি। সঙ্গে শুকনো ছাতু, নুন, লংকা ছিল— তা-ই খেয়েছেন। এখানে স্নান-খাওয়া সেরে তোফা ঘুম লাগিয়ে রাত গভীর হলে বেরবেন আবার। সাফ জানালেন, এখানকার খানা টেস্টি অউর মহেঙ্গা নহি। তা ছাড়া নাহানে অউর টাট্টি করনে কা প্লেস বহত সাফসুতরা আছে। সব চাইতে বড় কথা, সিকিয়োরড ভি হ্যায়। ঝাঝাঙ্গি ধাবায় বেশ কয়েক বছর আগে একবারই ডাকাত হানা দিয়েছিল। তারপর থেকে পুলিশ পোস্টিং থাকে।

বিরাট স্নানাগারে পরিষ্কার জলের অবিরাম সরবরাহ। জল তুলে স্নান করার জন্য বাঁধানো ঘাট। চমৎকার নিকাশি ব্যবস্থা। দূরে সার সার টয়লেট। প্রতিবার ব্যবহারের পর সাফাই করে দেওয়ার জন্য কর্মচারী। সার সার খাটিয়া পাতা এক বিরাট ঘর, বিশ্রামের জন্য। আলো-হাওয়ার ভাল ব্যবস্থা। অন্য দিকে খাবার জন্য চেয়ার-টেবিল এবং দড়ির খাটিয়া— দু'ধরনের আয়োজনই আছে। বারাসতের অলোক গুহ নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে, ব্যবসার কাজে। রাবড়িতে রুটির টুকরো ডুবিয়ে বললেন, 'এখানে অনেকবার এসেছি। তরকা-রুটি দারুণ লাগে। রাবড়িটাও খাসা। আর পুরো ব্যাপারটা খোলামেলা। কোথায় কী রান্না হচ্ছে আপনি দেখতে পারছেন।'

কথাটা খাঁটি। টিনের চাল দেওয়া চারদিক খোলা জমিতে কাঠের উনুনে, লোহার কড়াইতে জ্বাল দেওয়া হচ্ছে দুধ। সার সার উনুনে হাতে গড়া রুটি কোয়ান্টামের গতিতে বানিয়ে ফেলছে কারিগররা। তরকা বানাতে গিয়ে প্যানগুলি জাগলারের কায়দায় নাড়াচ্ছে এক দল। আচার আর মোরব্বা অবশ্যি বানিয়ে আনা হয় বাইরে থেকে। বোতলবন্দি হয়ে বিক্রি হয় সেসব। গোড়া থেকেই ঝাঝাঙ্গি ধাবার রুটি-তরকা বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। নিরামিষ বা ডিম-তরকা— দুয়েরই খ্যাতি ছড়িয়েছিল দ্রুত। কোচবিহারের নিশিগঞ্জ থেকে আসা একটি পরিবার এখানেই লাঞ্চ সেরে গরুমারা অরণ্যে যাবেন। কর্তা জানালেন, 'এখানে রুটি-তরকা আর আমলকীর মোরব্বা খেয়ে যা খরচা হয়েছে, তা দিয়ে কোনও ভাল রেস্টুরেন্টে একজনের খাবারও হবে না। বাড়তি পাওনা ফ্রেশ হওয়ার জন্য পরিপাটি আয়োজন।'

এখানকার রুটি-তরকার স্বাদ একটু বেশিই ভাল? কোনও গোপন রেসিপি আছে নাকি? প্রশ্ন শুনে একজন কারিগর হেসে বললেন, 'তরকা-রুটি বানানো কী এমন ব্যাপার দাদা? আসলে আমরা ডালগুলো খুব দেখে আনাই। ভাল করে ভিজিয়ে নিই। উনুনের আঁচ ঠিক রাখি। আর রুটির জন্য সেরা আটা আনাই। ভাল করে মাখি। আমাদের উনুন চব্বিশ ঘণ্টা জ্বলে। আমরা রুটি বানিয়ে হট পটে রেখে দিই না।'

দুধ জ্বাল দিতে দিতে আরেক কারিগর জানালেন, 'রাবড়ির স্বাদ ঠিকমতো আনতে গেলে কয়লার উনুন বা গ্যাস চলবে না। কাঠের উনুনে লোহার কড়াইতে ঢিমে আঁচে জ্বাল দিতে হবে।' এসব শোনার পর দেখলাম, রান্নার ব্যাপারে ঝাঝাঙ্গি সনাতন পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। কয়লা আর কাঠের আগুনে যে আলাদা স্বাদ হয়, সেটা মনে রেখেছে কর্তৃপক্ষ। অবশ্য বর্তমান কর্তাকে পাওয়া যায়নি। ম্যানেজার তো কাউন্টার থেকে উঠতেই পারছিলেন না। মিনিটে অন্তত দু'জন আসছিল বিল দিতে। এই ধাবা ঝাঝাঙ্গি এলাকার অর্থনীতিতেও খানিকটা অক্সিজেন জুগিয়েছে। দূরদূরান্তে পাড়ি দেওয়া মানুষদের প্রয়োজনীয় আরও আরও জিনিসপত্র সরবরাহে স্থাপিত হয়েছে অনেকগুলি দোকান। উঠেছে বাড়িঘর। একদা জনমানবশূন্য অন্ধকার এলাকা এখন আলোকময় ছোটখাটো বাজার। ঝাঝাঙ্গি বাস স্টপেও তার ছোঁয়া লেগেছে। এসেছে খাওয়ার হোটেল। একদা অখ্যাত ঝাঝাঙ্গির নাম এখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে ট্রাকচালক ও খালাসির দল। ভোজনপ্রিয় মানুষের মুখে মুখে ডুয়ার্সের আনাচকানাচে ঝাঝাঙ্গি পরিচিতি পেয়েছে।

আগেই বলেছিলাম, ম্যানেজারের দায়িত্ব থাকা ভদ্রলোকের সময় হচ্ছিল না। তাও ফাঁকে ফাঁকে জানালেন যে, এখানে কর্মচারীর নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা নেই। গড়ে ষাট-সত্তরজন থাকে। এটা কমে-বাড়ে। বর্ষায় সাধারণ মানুষ কম আসেন। তখন কমে যায় কর্মচারী। আবার উৎসবের দিনগুলোতে যখন ভিড়ে ভিড়াক্কার, তখন বাড়তি কর্মচারী দরকার হয়। ভিড়ের দাপটে রাঁধুনিরা সময় পাচ্ছিলেন না। তার মধ্যেই একজন জানালেন তরকার রেসিপি।

**নিজস্ব প্রতিবেদন**

# ফুটবল পাগল ভোলা রায়

নিজের বিয়ের বউভাতের অনুষ্ঠান ছেড়ে তিনি উড়লেন কলকাতার পথে। সেকালটা একালের মতো নয়, যান্ত্রিক সভ্যতার তেমন বিকাশ হয়নি। ঘরে ঘরে তেমনভাবে পৌঁছায়নি বৈদ্যুতিক আলো। এত মানুষজনও ছিল না গ্রাম-বাংলার জনপদে। ছেলেকে মাঠ থেকে কিছুটা ঘরমুখো করার জন্য সদ্য যৌবনে প্রবেশ করা ভোলা রায়কে বিয়ে দেন তাঁর বাবা। বিয়ে করে বাড়ি ফিরতেই কোচবিহারের এক প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী গোবিন্দ পোদ্দার নিয়ে এলেন সংবাদ। রাজস্থান ক্লাব কলকাতায় 'এ' ডিভিশন ফুটবল ম্যাচ খেলবার জন্য কোচবিহারের ভোলা রায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সদ্যবিবাহিত স্ত্রীকে বাবা, মা, দাদা, দিদিদের দায়িত্বে রেখে কোচবিহার-দমদম উড়ানে রওনা দিলেন কলকাতা। খেলার মাঠে ভোলা নামে পরিচিত হলেও লক্ষপতি রায় সরকারের পুত্রের প্রকৃত নাম প্রদীপ রায় সরকার। সত্তরোর্ধ্ব প্রদীপবাবুকে এখনও সবুজ মাঠ টানে। নিয়মিত ফুটবল প্র্যাকটিস না করলেও তিনি মাঠে যান, ভোকাল টনিক দেন। ২০০৭ সালে ভোলাবাবু নতুন খেলোয়াড় তৈরির উদ্দেশ্যে গড়ে তুলেছেন ঠাকুর পঞ্চানন স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। বর্তমানে এই অ্যাকাডেমির পক্ষ থেকে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের মধ্যে খেলাধুলার মানসিকতা গড়তে কোচবিহার ২ নং ব্লকের বড়রাংরম এলাকায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এই অ্যাকাডেমি ভালো, ফুটবল ও অ্যাথলিট চর্চা করছে নিয়মিত।

ভোলাবাবু স্কুল পর্যায় খেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন দর্শকদের। রামভোলা স্কুলের এই ছাত্রকে কার্যত হাইজ্যাক করে নিয়ে যায় জেনকিথ স্কুল। স্কুল পর্যায়ে খেলতে খেলতেই ক্লাব স্তরের খেলায় প্রবেশ ভোলাবাবুর। ১৯৫৬ সালে কোচবিহার বাণীমন্দির ক্লাবে পরবর্তীতে আন্নন ক্লাব এবং তারপরে জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবে খেলে নিম্ন অসম ও উত্তরবঙ্গের মাঠ কাঁপিয়েছেন। ক্লাব স্তরে ফুটবল খেলতে খেলতেই উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরে চাকরি। ১৯৬২ সালে অল ইন্ডিয়া স্কুল ফুটবল টুর্নামেন্টে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল দলের নেতৃত্ব দেন ভোলা রায়। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত জাতীয় স্তরের সন্তোষ ট্রফি, বরদলৈ ট্রফি, ডুরান্ড, রোভার্স, আইএফএ, ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রভৃতি খেলেছেন। বেঙ্গল লাইন ছেড়ে অসমে চলে যাওয়ায় ফুটবলার হিসেবে জাতীয় স্তরে তেমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি বলে আক্ষেপ তৈরি। রাজস্থান ক্লাবের হয়ে খেলার সময় পি কে ব্যানার্জি তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন কলকাতা না ছাড়ার। মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধেও বহুবার খেলেছেন তিনি। বিশিষ্ট গোলকিপার থঙ্গরাজকে গোল দেওয়া তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। প্রদর্শনী ম্যাচে মোহনবাগানের হয়ে কোচবিহার এমজেএন স্টেডিয়ামে খেলতে এসেছিলেন থঙ্গরাজ।

**মোহনবাগান-ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের বিরুদ্ধেও বহুবার খেলেছেন তিনি। বিশিষ্ট গোলকিপার থঙ্গরাজকে গোল দেওয়া তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।**

কোচবিহারে তিনি গঠন করেন নর্থ বেঙ্গল ক্লাব। কোচবিহার গুঞ্জবাড়ি এলাকায় এই ফুটবল ক্লাবের স্থায়ী ঠিকানা হয় একটি সেলুন। আটের দশকে এই ক্লাব কোচবিহারের ক্রীড়াজগতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যদিও এই ক্লাবের অস্তিত্ব এখন আর নেই। তবে ফুটবলার তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে এখনও তিনি মাঠে যান। সবুজ মাঠ ও ফুটবল নাকি তাঁকে সর্বদাই আহ্বান জানায়।

**পিনাকী মুখোপাধ্যায়**

# প্রহেলিকার ডুয়ার্স

নিচের তিনটি ধাঁধায় ডুয়ার্সের তিনটি স্থানের নাম লুকিয়ে আছে। খুঁজে বার করুন আর দেওয়ালিতে তিনটে আলো বেশি জ্বালান।

১
শেষ দুই আন্ডা সব মিলে চার।
বাদ্যের শব্দ কী? বলব না আর।।

২
জলে ডোবায় নাকাল কি না বলতে পারি না।
গামছা দিয়ে যা মোছো তা গোড়ায় আছে না?

৩
শেষ দুয়েতে দাঁড়িয়ে বগা যে।
গোড়ায় যাকে ভাবছ এল সে।।

৪
পটলরাম পর্যটক ডুয়ার্সের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দুটো বনমানুষ তাঁকে ধরে বলল, 'একটা শ্লোক বলছি। এটা শোনার পর যদি কোনও নদীর নাম মনে পড়ে, তবে সেটা ঠিকঠাক বললে ছেড়ে দেব।' এই বলে আবৃত্তি করল—

জগৎ জননী যদি জনহীন বনে।
লংকার ঝাল খেয়ে কাঁদে আনমনে।।
ঢাক কভু বাজিবে কি ঢাকা নগরীতে
কাকে বলো শুধাবে তা এই পৃথিবীতে।।

পটলরাম বলে দিল নদীর নাম। এবার বলুন তো, সে নামটা কী আর সে কীভাবে সেটা পেল?

**ব্যাসকূট বসু**

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-8, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

# এখন ডুয়ার্স নিয়মিত পাচ্ছেন তো ?

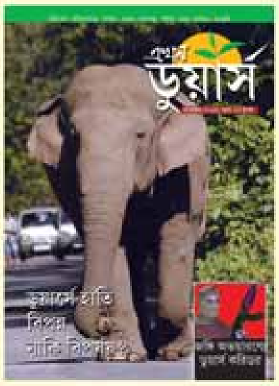

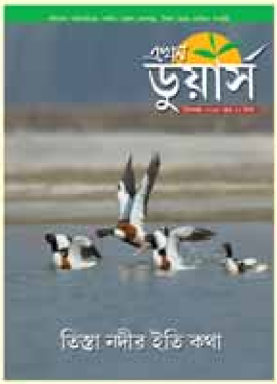

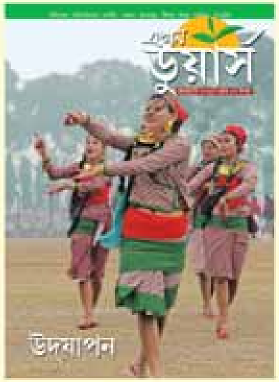

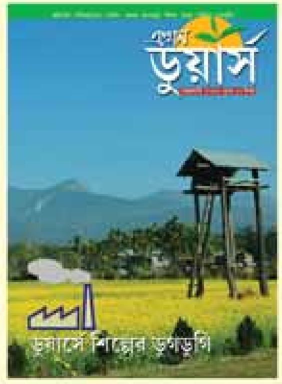

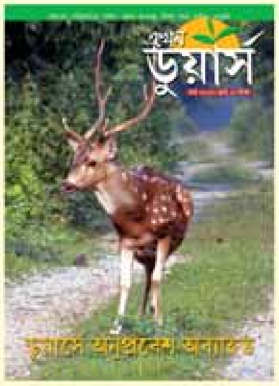

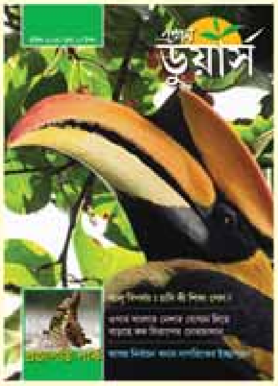

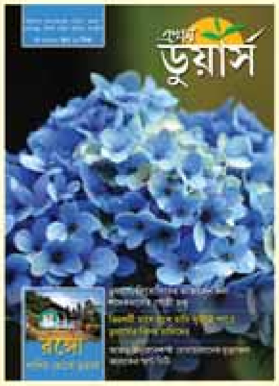

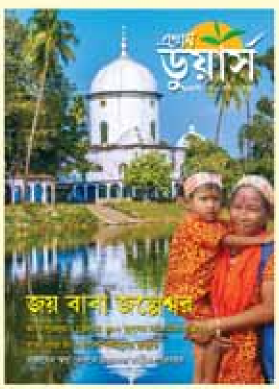

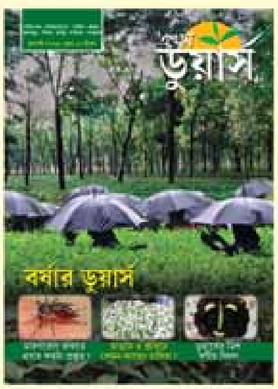

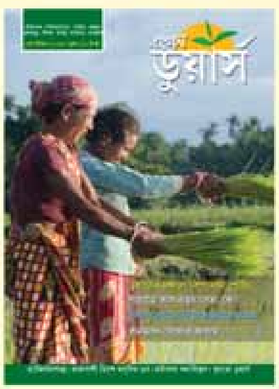

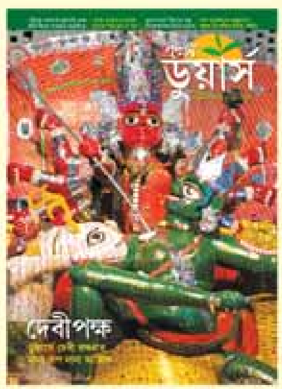


গত এক বছর **এখন ডুয়ার্স** নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে প্রত্যেক মাসের গোড়াতে। **এখন ডুয়ার্স** পাঠকদের অনুরোধ জানাই গত বারোটি সংখ্যা আপনার হাতে এসেছে কি না একবার মিলিয়ে নিন। পত্রিকা নিয়মিত না পেলে বা কোথায় নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে, ইত্যাদি ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করবেন ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে। খুব শীঘ্রই শুরু হচ্ছে বইমেলার মরশুম। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ি বইমেলায় হাজির থাকব আমরাও। **এখন ডুয়ার্স** স্টলে আপনাদের আগাম আমন্ত্রণ রইল।

এখন ডুয়ার্স
পরিবেশ | পরিকাঠামো | পর্যটন
জঙ্গল | জনসত্তা
শিক্ষা | স্বাস্থ্য | সাহিত্য | সংস্কৃতি

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.